প্রবন্ধ

কৃষ্ণচরিত্র

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খণ্ড

BENGALIEBOOK.COM
2021

সূচিপত্র

- প্রথম পরিচ্ছেদ–যদুবংশ 2
- দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ–কৃষ্ণের জন্ম 5
- তৃতীয় পরিচ্ছেদ–শৈশব 7
- চতুর্থ পরিচ্ছেদ–কৈশোর লীলা 11
- পঞ্চম পরিচ্ছেদ–ব্রজগোপী- বিষ্ণুপুরাণ 18
- ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ–ব্রজগোপী। 29
- সপ্তম পরিচ্ছেদ–ব্রজ গোপী- ভাগবত 34
- অষ্টম পরিচ্ছেদ–ব্রজগোপী- ভাগবত 40
- নবম পরিচ্ছেদ–ব্রজগোপী- ভাগবত 42
- দশম পরিচ্ছেদ–শ্রীরাধা 46
- একাদশ পরিচ্ছেদ–বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি 62

প্রথম পরিচ্ছেদ—যদুবংশ

প্রথম খণ্ডে আমরা পুরুবার পুত্র আয়ুর কথা বলিয়াছি। আয়ু যজুর্ব্বেদে যজ্ঞের ঘৃত মাত্র। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতার ১০ম মণ্ডলে তিনি ঐতিহাসিক রাজা। ১০ম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তের ঋষি বৈকুণ্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি বেশকে আয়ুর বশীভূত করিয়া দিয়াছি।"

আয়ুর পুত্র নহুষ। নহুষের পুত্র যযাতি। এই নহুষ ও যযাতির নামও ঋগ্বেদসংহিতায় আছে। যযাতির পাঁচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কথিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ যদু, কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম তুর্ব্বসু দ্রুহ্য, অণু। ইহার মধ্যে পুরু, যদু, এবং তুর্ব্বসুর নাম ঋগ্বেদসংহিতায় আছে (১০ম, ৪৮। ৪৯ সূক্ত)। কিন্তু ইঁহারা যে যযাতির পুত্র বা পরস্পরের ভাই, এমন কথা ঋগ্বেদসংহিতায় নাই।

কথিত আছে, যযাতির জ্যেষ্ঠ চারি পুত্র তাঁহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি ঐ চারি পুত্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। এই পুরুর বংশে দুষ্মন্ত, ভরত, কুরু এবং অজমীঢ় ইত্যাদি ভূপতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি কৌরবেরা এই পুরুর বংশ। এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবেরা যদুর বংশ। অন্ততঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যদু হইতে মথুরাবাসী যাদবদিগের উৎপত্তি।

কিন্তু হরিবংশে আর এক কথা পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্ব্বে যে যদুবংশকথন আছে, তাহাতে যযাতিপুত্র যদুরই বংশকথন। কিন্তু বিষ্ণুপর্ব্বে ভিন্ন প্রকার আছে। তথায় আছে যে, হর্য্যশ্ব নামে একজন ইক্ষ্বাকুবংশীয়, অযোধ্যায় রাজা ছিলেন। তিনি মধুবনাধিপতি মধুর কন্যা মধুমতীকে বিবাহ করেন। এই মধুবনই মথুরা। হর্য্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদূরিত হইলে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া বাস করেন। ইঁহারই পুত্র যদু।

হর্যশ্বের লোকান্তরে ইনি রাজা হয়েন। যদুর পুত্র মাধব, মাধবের পুত্র সত্ত্বত, সত্ত্বতের পুত্র ভীম। মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা শত্রুঘ্ন বিজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিয়া মথুরানগর নির্মাণ করেন। হরিবংশে বলে, রাঘবেরা মথুরা ত্যাগ করিয়া গেলে, ভীম তাহা পুনর্বার অধিকার করেন, এবং এই যদুসম্ভূত বংশই মথুরাবাসী যাদবগণ।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৬২ সূক্তে যদু ও তুর্বা (তুর্বসু) এই দুই জনের নাম আছে (১০ ঋক্), কিন্তু তথায় ইঁহাদিগকে দাসজাতীয় রাজা বলা হইয়াছে।

কিন্তু ঐ মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "তুর্বসু ও যদু এই দুই ব্যক্তিকে আমি বলবান্ বলিয়া খ্যাতাপন্ন করিয়াছি (৮ ঋক্)"। ঐ সূক্তের ৩ ঋকে আছে, "আমি দস্যুজাতিকে 'আর্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।"* তবে দাসজাতীয় রাজাকে যে তিনি খ্যাতাপন্ন করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায়? এই যদু আর্য, না অনার্য? ইহা ঠিক বুঝা গেল না।

পুনশ্চ, প্রথম ৩৬ সূক্তে ১৮ ঋকের অর্থ এইরূপ–"অগ্নির দ্বারা তুর্বসু, যদু ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান করি।" অনার্য রাজ সম্বন্ধে আর্য ঋষির এরূপ উক্তি সম্ভব কি?

যাহা হউক তিন জন যদুর কথা পাই।

(১) যযাতিপুত্র

(২) ইক্ষ্বাকুবংশীয়।

(৩) অনার্য রাজা।

কৃষ্ণ, কোন্ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা মীমাংসা করা দুর্ঘট। যখন তাঁহাদের মথুরায় ভিন্ন পাই না, এবং ঐ মথুরা ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের নির্মিত, তখন এই যাদবেরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না।

যে যদুবংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সত্ত্বত বৃষ্ণি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ প্রভৃতি রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বৃষ্ণি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, একত্রে মথুরায় বাস করিতেন। কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয়, কংস ও দেবকী ভোজবংশীয়। কংস ও দেবকীর এক পিতামহ।

www.bengaliebook.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—কৃষ্ণের জন্ম

কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের পিতা বসুদেব, দেবকীর স্বামী।

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রীতিপূর্বক তাঁহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দৈববাণী হইল যে, ঐ দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে। তখন আপদের শেষ করিবার জন্য কংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে শান্ত করিয়া অঙ্গীকার করিলেন যে, তাঁহাদের যতগুলি পুত্র হইবে, তিনি স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন। ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা হইল, কিন্তু কংস বসুদেব ও দেবকীকে অবরুদ্ধ করিলেন। এবং তাঁহাদের প্রথম ছয় সন্তান বধ করিলেন। সপ্তমগর্ভস্থ সন্তান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল। পুরাণে কথিত হইয়াছে বিষ্ণুর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্রা সেই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া বসুদেবের অন্যা পত্নীর গর্ভে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সেই অন্যা পত্নী রোহিণী। মথুরার অদূরে, ঘোষপল্লীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর বাস। তিনি বসুদেবের আত্মীয়। রোহিণীকে বসুদেব সেই নন্দের গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। এই পুত্র, বলরাম।

দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন। এবং যথাকালে রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইলেন। বসুদেব তাঁহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন। সেই রাত্রে নন্দপত্নী যশোদা একটি কন্যা প্রসব করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই বৈষ্ণবী শক্তি যোগনিদ্রা। ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব পুত্রটিকে সূতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটিকে লইয়া স্বভবনে আসিলেন। সেই কন্যাকে তিনি কংসকে আপন কন্যা বলিয়া সমর্পণ করিলেন। কংস তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে পারিলেন না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের নিধনকারী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। কংস তারপর ভগিনীকে কারামুক্ত করিলেন। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন।

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার; আমরা পূর্বকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য। তবে ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় যদুবংশে, দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি শৈশবে তাঁহাকে তাঁহার পিতা নন্দালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। নন্দালয়ে* পুত্রকে লুকাইয়া রাখার জন্য তাঁহাকে কংসনাশবিষয়িণী দৈববাণীর বা কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই। ভাগবত পুরাণে এবং মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় দুরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সে ঔরঙ্গজেবের মত আপনার পিতা উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়া, আপনি রাজ্যাধিকার করিয়াছিল। যাদবদিগের উপর এরূপ পীড়ন আরম্ভ করিয়াছিল যে, অনেকে যাদব ভয়ে মথুরা হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে গিয়া বাস করিতেছিলেন। বসুদেবও আপনার অন্যা পত্নী রোহিণীকে ও তাঁহার পুত্রকে নন্দালয়ে রাখিয়াছিলেন। এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে সেই নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। ইহা সম্ভব এবং ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

----

* কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষ্ণের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথা আমি পুনশ্চ উপযুক্ত স্থানে উদ্ধৃত করিব। এক্ষণে আমার বক্তব্য যে, এক্ষণে পুনর্বার বিশেষ বিবেচনা করিয়া সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনার ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই–ক্ষুদ্রবুদ্ধি ব্যক্তির ভ্রান্তি সচরাচরই ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—শৈশব

কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসর্গিক কথা পুরাণে কথিত হইয়াছে। একে একে তাহার পরিচয় দিতেছি।

১। পূতনাবধ। পূতনা কংসপ্রেরিতা রাক্ষসী। সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ করিয়া নন্দালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল। তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল। সে শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিপীড়িত করিয়া স্তন্যপান করিলেন যে, পূতনার প্রাণ বহির্গত হইল। সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ ভূমি ব্যাপিয়া নিপতিত হইল।

মহাভারতেও শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে পূতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, পূতনাকে শকুনি বলিতেছেন। শকুনি বলিলে, গৃধ্র, চীল এবং শ্যামাপক্ষীকেও বুঝায়। বলবান্ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ করা বিচিত্র নহে।

কিন্তু পূতনার আর একটা অর্থ আছে। আমরা যাহাকে "পেঁচোয় পাওয়া" বলি, সূতিকাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পূতনা। সকলেই জানে যে, শিশু বলের সহিত স্তন্যপান করিতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না। বোধ হয়, ইহাই পূতনাবধ।

২। শকটবিপর্যয়। যশোদা, কৃষ্ণকে একখানা শকটের নীচে শুয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পদাঘাতে শকট উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। ঋগ্বেদসংহিতায় ইন্দ্রকৃত ঊষার শকটভঞ্জনের একটা কথা আছে। এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন রূপকের নূতন সংস্কারমাত্র হইতে পারে। অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণলীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে।

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বম্ভরমূর্তিধারণ, এবং স্বীয় ব্যাদিতানন-মধ্যে যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখান। এটা প্রথম ভাগবতে দেখিতে পাই। ভাগবতকারেরেই রচিত উপন্যাস বোধ হয়।

৪। তৃণাবর্ত। তৃণাবর্ত নামে অসুর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল। ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্রবায়ু মাত্র। চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অসূর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে। এই উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই। সুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই। চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে।

৫। কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, যশোদা তাঁহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিয়া বদনমধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইলেন। এটিও কেবল ভাগবতীয় উপন্যাস।

৬। ভাগবতকার আরও বলেন, কৃষ্ণ হাঁটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের গৃহে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিতেন। অন্যান্য দৌরাত্ম্যমধ্যে, ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন। বিষ্ণুপুরাণেও এ কথা নাই; মহাভারতেও নাই।

হরিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে। ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি। যে শিশুর ধর্মাধর্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাদ্য চুরি করিলে কোন দোষ হইল না। যদি বল যে, কৃষ্ণকে তোমরা ঈশ্বরাবতার বল; তাঁহার কোন বয়সেই জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে না। তাহার উত্তরে কৃষ্ণোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের চুরি নাই। জগতই যাঁহার–সব ঘৃত নবনীত মাখন যাঁহার সৃষ্ট–তিনি কার ধন লইয়া চোর হইলেন? সবই ত তাঁহার। আর যদি বল, তিনি মানবধর্মাবলম্বী-মানবধর্মে চুরি অবশ্য পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, কেন না, শিশুর ধর্মাধর্ম জ্ঞান নাই। কিন্তু এ সকল বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজনই নাই–কেন না, কথাটাই অমূলক। যদি মৌলিক কথা হয়, তবে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা বড় মনোহর।

ভাগবতকার বলিয়াছেন যে, ননী মাখন ভগবান্ নিজের জন্য বড় চুরি করিতেন না; বানরদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়া পড়িয়া কাঁদিতেন। ভাগবতার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্বভূতে সমদর্শী; গোপীরা যথেষ্ট ক্ষীর নবনীত খায়,–বানরেরা পায় না, এজন্য গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন। তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর, গোপী ও বানর তাঁহার নিকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারী।

এই শিশু সর্বজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, সর্বজনের দুঃখমোচনে উদ্যুক্ত। তির্যকজাতি বানরদিগের জন্য তাঁহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন। আর একটি দুঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথা বলিয়াছেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আসিলে কৃষ্ণ অঞ্জলি ভরিয়া তাহাকে রত্ন দিলেন। কথাগুলির ভাগবত ব্যতীত প্রমাণ কিছু নাই; কিন্তু আমরা পরে দেখিব, পরহিতই কৃষ্ণের জীবনের ব্রত।

৭। যমলার্জুনভঙ্গ। একদা কৃষ্ণ বড় "দুরন্তপনা" করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা তাঁহার পেটে দড়ি বাঁধিয়া, একটা উদূখলে বাঁধিয়া রাখিলেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া লইয়া চলিলেন। যমলার্জুন নামে দুইটা গাছ ছিল। কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া চলিলেন। উদূখল, গাছের মুলে বাধিয়া গেল। কৃষ্ণ তথাপি চলিলেন। গাছ দুইটা ভাঙ্গিয়া গেল।

এ কথা বিষ্ণুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্য আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? অর্জুন বলে কুরচি গাছকে; যমলার্জুন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায়। যদি চারাগাছ হয়, তাহা হইলে বলবান্ শিশুর বলে ঐরূপ অবস্থায় তাহা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাগবতকার পূর্বপ্রচলিত কথার উপর, অতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। গাছ দুইটি কুবেরপুত্র; শাপনিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণস্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে গমন করিল। কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও কচি ছেলের পেট বাঁধা গেল না। শেষে কৃষ্ণ দয়া করিয়া বাঁধা দিলেন।

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর। বহিরিন্দ্রিয়নিগ্রহকে দম বলে। উদ্ উপর, ঋ গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি। দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, তিনিই দামোদর। বেদে আছে, বিষ্ণু তপস্যা করিয়া বিষ্ণুত্ব লাভ করিয়াছেন, নহিলে তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র। শঙ্করাচার্য দামোদর শব্দের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দমাদিসাধনেন উদরা উৎকৃষ্টা গতির্যা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ।" মহাভারতেও আছে, "দমাদ্দামোদরং বিদুঃ।"

কিন্তু দামন্ শব্দে গোরুর দড়িও বুঝায়। যাহার উদর গোরুর দড়িতে বাঁধা হইয়াছিল, সেও দামোদর। গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা প্রচলিত ছিল। নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাঁধার উপন্যাসটি গড়িয়াছেন, এই বোধ হয় না কি?

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্ববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিলেন। কৃষ্ণ নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা বৃন্দাবন গেলেন, এইরূপ পুরাণে লিখিত আছে। বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এ জন্যও হইতে পারে। হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময় ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল। গোপেরা তাই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—কৈশোর লীলা

এই বৃন্দাবন কাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিৎপুষ্পশোভিত পুলিনশালিনী কলনাদিনী কালিন্দীকূলে কোকিল-ময়ূর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপরিপূর্ণা, গোপবালকগণের শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শব্দময়ী, অসংখ্যকুসুমামোদসুবাসিতা, নানাভরণভূষিতা, বিশালায়তলোচনা ব্রজসুন্দরীগণসমলঙ্কৃতা বৃন্দাবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হৃদয় উৎফুল্ল হয়। কিন্তু কাব্যরস আস্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমাদের সময় নাই। আমরা আরও গুরুতর তত্ত্বের অন্বেষণে নিযুক্ত।

ভাগবতকার বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসূর বধ করিলেন,—(১) বৎসাসুর, (২) বকাসুর, (৩) অঘাসুর। প্রথমটি বৎসরূপী, দ্বিতীয়টি পক্ষিরূপী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান্ বালক, ঐ সকল জন্তু গোপালগণের অনিষ্টকারী হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও কথা বিষ্ণুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য।

এই বৎসাসুর, বকাসুর এবং অঘাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ত্ব খুঁজিলে না পাওয়া যায়, এমত নহে। বদ্ ধাতু হইতে বৎস; বন্ক্ ধাতু হইতে বক, এবং অঘ্ ধাতু হইতে অঘ। বদ ধাতু প্রকাশে, বন্ক্ কৌটিল্যে, এবং অঘ্ পাপে। যাহারা প্রকাশ্যবাদী বা নিন্দক, তাহারা বৎস, কুটিল শত্রুপক্ষ বক, পাপীরা অঘ। কৃষ্ণ অপ্রাপ্তকৈশোরেই এই ত্রিবিধ শত্রু-পরাস্ত করিলেন। যজুর্বেদের মাধ্যন্দিনী শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্নিচয়নমন্ত্রের ৮০ কণ্ডিকায় যে মন্ত্র, তাহাতে এইরূপ শত্রুদিগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যায়। মন্ত্রটি এই;—

"হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহারা দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার শত্রুকেই ভস্মসাৎ কর।"[1]

এই মন্ত্রের বেশির ভাগ অরাতি অর্থাৎ যাহারা ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচনাকালে এই মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয়। অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, ঐ রূপকের মূল ঐ মন্ত্রে আছে।

তার পর ভাগবতে আছে যে, ব্রহ্মা, কৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য একদা মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গোবৎসগণকে হরণ করিলেন। কৃষ্ণ আর এক সেট্‌ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি করিয়া পূর্ববৎ বিহার করিতে লাগিলেন। কথাটার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম। তার পর একদিন, কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান করিলেন। শৈবদিগের নীলকণ্ঠের বিষপানের উপন্যাস আছে। বৈষ্ণবচূড়ামণি তাঁহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বলিলেন।

এই বিখ্যাত কালিয়দমনের কথা বলিবার স্থান। কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাত্র মহাভারতে নাই। হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে। ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই উপন্যাসমাত্র—অনৈসর্গিকতায় পরিপূর্ণ। কেবল উপন্যাস নহে—রূপক। রূপকও অতি মনোহর।

উপন্যাসটি এই। যমুনার এক হ্রদে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প সপরিবারে বাস করিত। তাহার বহু ফণা। বিষ্ণুপুরাণের মতে তিনটি,[2] হরিবংশের মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুত্র পৌত্র ছিল। তাহাদিগের বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ তিষ্ঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবৎস সেই জল পান করিয়া প্রাণ হারাইত। সেই বিষের জ্বালায়, তীরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না। পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে পতিত হইত। এই মহাসর্পের দমন করিযা বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উল্লম্ফনপূর্বক হ্রদমধ্যে নিপতিত হইলেন। কালিয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ করিয়া বংশীধর গোপবালক নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া রুধিরবমনপূর্বক মুমূর্ষু হইল।

তখন তাহার বনিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্যভাষায় স্তব করিতে লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ভুজঙ্গমাঙ্গনাগণকে দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা বলিয়া বোধ হয়। বিষ্ণুপুরাণে তাহাদিগের মুখনির্গত স্তব বড় মধুর; পড়িয়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্নীগণকে কেহ গরলোদ্গারিণী মনে করেন করুন, নাগপত্নীগণ সুধাবর্ষিণী বটে। শেষে কালিয় নিজেও কৃষ্ণস্তুতি আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কালিয়কে পরিত্যাগ করিয়া যমুনা পরিত্যাগপূর্বক সমুদ্রে গিয়া বাস করিতে তাহাকে আদেশ করিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল। যমুনা প্রসন্নসলিলা হইলেন।

এই গেল উপন্যাস। ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই। এই কলবাহিনী কৃষ্ণসলিলা কালিন্দী অন্ধকারময়ী ঘোরনাদিনী কালস্রোতস্বতী। ইহার অতি ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপৎকাল মনে করি, তাহাই কালস্রোতের আবর্ত। অতি ভীষণ বিষময় মনুষ্যশত্রু সকল এখানে লুক্কায়িত ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাদের কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের ন্যায় অমোঘ বিষ। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধবিশেষে এই ভুজঙ্গের তিন ফণা। আর যদি মনে করা যায় যে, আমাদের ইন্দ্রিয়রতিই সকল অনর্থের মূল, তাহা হইলে, পঞ্চেন্দ্রিয়ভেদে ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার সহস্র ফণা। আমরা ঘোর বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বশীভূত হইলে জগদীশ্বরের পাদপদ্ম ব্যতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। কৃপাপরবশ হইলে তিনি এই বিষধরকে পদদলিত করিয়া মনোহর মূর্তিবিকাশপূর্বক অভয়বংশী বাদন করেন, শুনিতে পাইলে জীব আশান্বিত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। করালনাদিনি কালতরঙ্গিণী প্রসন্নসলিলা হয়। এই কৃষ্ণসলিলা ভীমনাদিনী কালস্রোতস্বতীর আবর্তমধ্যে অমঙ্গলভুজঙ্গমের মস্তকারূঢ় এই অভয়বংশীধর মূর্তি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি! যে গড়িয়া পূজা করিবে কে তাহাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাহস করিবে?

আমরা ধেনুকাসুর (গর্দভ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বলিব না, কেন না, উহা বলরামকৃত–কৃষ্ণকৃত নহে। বস্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য, তাহা আমরা অন্য পরিচ্ছেদে বলিব, এখন কেবল গিরিযজ্ঞবৃত্তান্ত বলিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।

বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গোঁসাই ঠাকুরেরা এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্ধন আর এক দেশে। কিন্তু পুরাণাদিতে পড়ি, উহা বৃন্দাবনের সীমান্তস্থিত। ঐ পর্বত এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে উহা কোন কালে, কোন প্রাকৃতিক বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয়, অনেক সহস্র বৎসর ঐ ক্ষুদ্র পর্বত ঐ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্বার সংস্থাপিত করিয়াছিলেন।

উপন্যাসটা এই। বর্ষান্তে নন্দাদি গোপগণ বৎসর বৎসর একটা ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তাহার আয়োজন হইতেছিল। দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কেন ইহা হইতেছে? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন, বৃষ্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়া আমরা ও গোপগণ জীবনধারণ করি, এবং গোসকল দুগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের পূজা করা কর্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, আমরা কৃষী নহি। গাভীগণই আমাদের অবলম্বন, অতএব গাভীগণের পূজা, অর্থাৎ তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পূজা করুন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্তগণকে উত্তমরূপে ভোজন করান। তাহাই হইল। অনেক দীনদরিদ্র ক্ষুধার্ত এবং ব্রাহ্মণগণ (তাঁহারা দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন। গাভীগণ খুব খাইল। গোবর্ধনও মূর্তিমান্ হইয়া রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ নিজেই এই মূর্তিমান্ গিরি সাজিয়া খাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ হইল না। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদিগের পুরাণেতিহাসোক্ত দেবতা ও ব্রাহ্মণ সকল ভারী বদ্‌রাগী। ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ্ঞা দিলেন, বৃষ্টি করিয়া বৃন্দাবন ভাসাইয়া দাও। মেঘসকল তাহাই করিল। বৃন্দাবন ভাসিয়া যায়। গোবৎস ও ব্রজবাসিগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণ গোবর্ধন উপাড়িয়া বৃন্দাবনের উপর ধরিলেন। সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তিনি পর্বত এক হাতে তুলিয়া ধরিয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সন্ধি স্থাপন করিলেন।

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল বলিতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্মীকতুল্য গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই কি একটা বিচিত্র কথা? কৃষ্ণের প্রভূত অন্নব্যঞ্জনভোজন সম্বন্ধেও একটু ব্যঙ্গ আছে। এই পর্যন্ত। কিন্তু গোবর্ধন আজিও বিদ্যমান,—বল্মীক নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্বত সাত দিন এক হাতে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন? যাঁহারা তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, তাঁহারা বলিতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য কি? স্বীকার করি—কিন্তু সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করি, ঈশ্বরাবতারের পর্বতধারণের প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত মেঘ এক ফোঁটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধরিয়া বৃষ্টি হইতে বৃন্দাবন রক্ষা করিবার তাঁহার প্রয়োজন কি? যাঁহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদূরিত, বৃষ্টি উপশান্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, তাঁহার পর্বত তুলিয়া ধরিয়া সাত দিন খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি?

ইহার উত্তরে কেহ বলিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীলা। ইচ্ছময়ের ইচ্ছা, আমরা ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিব কি? ইহাও সত্য, কিন্তু আগে বুঝিব যে, ইনি ভগবান্, তাহার পর গিরিধারণ তাঁহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্ ইহা বুঝিব কি প্রকারে? ইঁহার কার্য দেখিয়া। যে কার্যের অভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি বুঝিতে পারিলাম না, সেই কার্যের কর্তা ঈশ্বর, এরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় কি? না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসর্গিক পরিত্যাগের যে নিয়ম আমরা সংস্থাপন করিয়াছি, তাহারই অনুবর্তী হইয়া এই গিরিধারণবৃত্তান্তও উপন্যাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয়। তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্ঞ হইতে বিরত করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তার পর বাকি অনৈসর্গিক ব্যাপারটা গোবর্ধনের উৎখাত ও পুনঃস্থাপিত অবস্থা অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

এরূপ কার্যের একটা নিগূঢ় তাৎপর্যও দেখা যায়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই বুঝাইতেছি।

এই জগতের একই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। ইন্দ্ ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক্ প্রত্যয় করিলে ইন্দ্র শব্দ পাওয়া যায়। অর্থ হইল যিনি বর্ষণ করেন। বর্ষণ করে কে? যিনি সর্বকর্তা, সর্বত্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি করেন,—বৃষ্টির

জন্য একজন পৃথক্ বিধাতা কল্পনা করা বা বিশ্বাস করা যায় না। তবে ইন্দ্রের জন্য যজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপূজার একটা অর্থও আছে। ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাঁহার গুণ সকল অনন্ত, কার্য অনন্ত, শক্তি সকলও সংখ্যায় অনন্ত। এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব? অনন্তের ধ্যান হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা করে। এরূপ শক্তি সকলের বিকাশস্থল জড়জগতে বড় জাজ্বল্যমান। সকল জড়পদার্থে তাঁহার শক্তির পরিচয় পাই। তৎ-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন আর্যগণ তাঁহার জগৎপ্রসবিতৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্যে, তাঁহার সর্বাবরকতা স্মরণ করিয়া বরুণে, তাঁহার সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ করিয়া অগ্নিতে, তাঁহাকে জগৎপ্রাণ স্মরণ করিয়া বায়ুতে, এবং তদ্রূপে অন্যান্য জড়পদার্থে তাঁহার আরাধনা করিতেন।[3] ইন্দ্রে এইরূপ তাঁহার বর্ষণকারিণী শক্তির উপাসনা করিতেন। কালে, লোকে উপাসনার অর্থ ভুলিয়া গেল, কিন্তু উপাসনার আকারটা বলবান্ রহিল। কালে এইরূপই ঘটিয়া থাকে; ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের অন্যত্র দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্মের এই মৃতদেহের সৎকারে প্রবৃত্ত—তৎপরিবর্তে অতি উচ্চ ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্রবৃত্ত করিতে যত্নবান্। যাহা পরিণত বয়সে প্রচারিত করিয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞে তাহার প্রবর্তনায় তাঁহার প্রথম উদ্যম। জগদীশ্বর সর্বভূতে আছেন; মেঘেও যেমন আছেন, পর্বতে ও গোবৎসেও সেইরূপ আছেন। যদি মেঘের বা আকাশের পূজা করিলে তাঁহার পূজা করা হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পূজা করিলেও তাঁহারই পূজা করা হইবে। বরং আকাশাদি জড়পদার্থের পূজা অপেক্ষা দরিদ্রদিগের এবং গোবৎসের সপরিতোষ ভোজন করান অধিকতর ধর্মানুমত। গিরিযজ্ঞের তাৎপর্যটা এইরূপ বুঝি।

------

1 সামশ্রমীকৃত অনুবাদ।

2 “মধ্যমং ফণং” ইহাতে তিনটি বুঝায়।

3 যখন আমি প্রথম "প্রচার" নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে কথা বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নূতন মত প্রচার করিতেছি। তাঁহারা জানেন না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমি যাস্কের বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি-

"মাহাত্ম্যাদ্ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোহন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। * * আত্মা এব এষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বাঃ, আয়ুধম্, আত্মা ইষবঃ, আত্মা সর্বদেবস্য।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী-বিষ্ণুপুরাণ

কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে কথা কৃষ্ণচরিত্রের প্রধান কলঙ্ক, এবং আধুনিক কৃষ্ণ-উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রস্বরূপ, আমি এক্ষণে সেই তত্ত্বে উপস্থিত। কৃষ্ণের সহিত ব্রজ গোপীদের সম্বন্ধের কথা বলিতেছি। কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনায় এই তত্ত্ব অতিশয় গুরুতর। এই জন্য এ কথা আমরা অতিশয় বিস্তারের সহিত কহিতে বাধ্য হইব।

মহাভারতে ব্রজগোপীদিগের কথা কিছুই নাই। সভাপর্বে শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায়ে শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে। যদি মহাভারত প্রণয়নকালে ব্রজগোপীগণঘটিত কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহা পরিত্যাগ করিতেন না। অতএব নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চলিত ছিল না—তাহার পরে গঠিত হইয়াছে।

মহাভারতে কেবল ঐ সভাপর্বে দ্রৌপদীবস্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দটা আছে, যথা—

"আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়!||"

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস। গোপ থাকিলেই গোপী থাকিবে। কৃষ্ণ অতিশয় সুন্দর, মাধুর্যময় এবং ক্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপগোপী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা, যুবতী বৃদ্ধা সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। বৃদ্ধা এবং যমলার্জুনভঙ্গ প্রভৃতি উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ রোদন করিত এরূপ লেখা আছে। অতএব এই 'গোপীজনপ্রিয়' শব্দে সুন্দর শিশুর প্রতি স্ত্রীজনসুলভ স্নেহ ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না।

আমরা পূর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুসারে মহাভারতের পর বিষ্ণুপুরাণ দেখিতে হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এখনও তেমনি দেখিব যে, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। এই ব্রজগোপীতত্ত্ব মহাভারতে

নাই, বিষ্ণুপুরাণে পবিত্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞ্চিত বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে তাহার স্রোত বহিয়াছে।

এই সকল কথা সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্ণুপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের কথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিতেছি। দুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার দুই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাৎ তাহা অনুবাদিত করিলাম।

“কৃষ্ণস্তু বিমলং ব্যোম শরচ্চন্দ্রস্য চন্দ্রিকাম্।
তথা কুমুদিনীং ফুল্লামামোদিতদিগন্তরাম্ ‖ ১৪ ||
বনরাজিং তথা কূজদ্ভৃঙ্গমালাং মনোরমাম্।
বিলোক্য সহ গোপীভির্মনশ্চক্রে রতিং প্রতি ‖ ১৫ ||
সহ রামেণ মধুরমতীব বনিতাপ্রিয়ম্।
জগৌ কলপদং শৌরির্নানাতন্ত্রী কৃত-ব্রতম্ ‖ ১৬ ||
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্যজ্যাবসথাংস্তদা।
আজগ্মুস্ত্বরিতা গোপ্যো যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ‖ ১৭ ||
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিৎ তস্য লয়ানুগম্।
দত্তাবধানা কাচিত্তু তমেব মনসা স্মরন্ ‖ ১৮ ||
কাচিৎ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রোক্ত্বা লজ্জামুপাগতা।
যযৌ চ কাচিৎ প্রেমান্ধা তৎপার্শ্বমবিলজ্জিতা ‖ ১৯ ||
কাচিদাবসথস্যান্তঃস্থিতা দৃষ্ট্বা বহির্গুরুন্।
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যৌ মীলিতলোচনা ‖ ২০ ||
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদ-ক্ষীণপুণ্যচয়া তথা।
তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা ‖ ২১ ||
চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ‖ ২২ ||

গোপীপরিবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাম্।
মানয়ামাস গোবিন্দো রাসারম্ভরসোৎসুকঃ ‖ ২৩ ||
গোপ্যশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ত্তমূর্তয়ঃ।
অন্যদেশং গতে কৃষ্ণে চেরুবৃন্দাবনান্তরম্ ‖ ২৪ ||
কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া ইদমূচুঃ পরস্পরম্।
কৃষ্ণোহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যালোক্যতাং গতিঃ।
অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্ ‖ ২৫ ||
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোহহমিতি চাপরা।
বাহুমাস্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্বস্বমাদদে ‖ ২৬ ||
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবর্ধনো ময়া ‖ ২৭ ||
ধেনুকোহয়ং ময়া ক্ষিপ্তো বিচরন্তু যথেচ্ছয়া।
গোপী ব্রবীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী ‖ ২৮ ||
এবং নানাপ্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টাসু তাস্তদা।
গোপ্যো ব্যগ্রাঃ সমঞ্চেরু রম্যং বৃন্দাবনং বনম্ ‖ ২৯ ||
বিলোক্যৈকা ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গনা।
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোৎপলা ‖ ৩০ ||
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাব্জাঙ্ক-রেখাবন্ত্যালি! পশ্যত।
পদান্যেতানি কৃষ্ণস্য লীলালঙ্কৃতগামিনঃ ‖ ৩১ ||
কাপি তেন সমং যাতা কৃতপুণ্যা মদালসা।
পদানি তস্যাশ্চৈতানি ঘনান্যল্পতনূনি চ ‖ ৩২ ||
পুষ্পাবচয়মত্রোচ্চৈশ্চক্রে দামোদরো ধ্রুবম্।
যেনাগ্রাক্রান্তিমাত্রাণি পদান্যত্র মহাত্মনঃ ‖ ৩৩ ||
অত্রোপবিশ্য সা তেন কাপি পুষ্পৈরলঙ্কৃতা।
অন্যজন্মনি সর্বাত্মা বিষ্ণুরভ্যর্চিতো যয়া ‖ ৩৪ ||

পুষ্পবন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্।
নন্দগোপসুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্যত ‖ ৩৫ ||
অনুযানেহসমথান্যা নিতম্বভরমন্থরা।
যা গন্তব্যে দ্রুতং যাতি নিম্নপাদাগ্রসংস্থিতিঃ ‖ ৩৬ ||
হস্তন্যস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সখি।
অনায়ত্তপদন্যাসা লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ‖ ৩৭ ||
হস্তসংস্পর্শমাত্রেণ ধূর্তেনৈষা বিমানিতা।
নৈরাশ্যমন্দগামিন্যা নিবৃত্তং লক্ষ্যতে পদম্ ‖ ৩৮ ||
নূনমুক্তা ত্বরামীতি পুনরেষ্যামি তেহন্তিকম্।
তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধতিঃ ‖ ৩৯ ||
প্রবিষ্টো গহনং কৃষ্ণঃ পদমত্র ন লক্ষ্যতে।
নিবর্তধ্বং শশাঙ্কস্য নৈতদ্দীধিতিগোচরে ‖ ৪০ ||
নিবৃত্তাস্তাস্ততো গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে।
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চরিতং তদা ‖ ৪১ ||
ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি-মুখপঙ্কজম্।
গোপ্যস্ত্রৈলোক্যগোপ্তারং কৃষ্ণমক্লিষ্ট-চেষ্টিতম্ ‖ ৪২ ||
কাচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্যদুদৈরয়ৎ ‖ ৪৩ ||
কাচিদ্ভ্রূভঙ্গুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিম্।
বিলোক্য নেত্রভৃঙ্গাভ্যাং পপৌ তন্মুখপঙ্কজম্ ‖ ৪৪ ||
কাচিদালোক্য গোবিন্দং নিমীলিত-বিলোচনা।
তস্যৈব রূপং ধ্যায়ন্তী যোগারূঢ়ের চাবভৌ ‖ ৪৫ ||
ততঃ কাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ভ্রূভঙ্গ-বীক্ষণৈঃ।
নিন্যেহনুনয়মন্যাশ্চ করস্পর্শেন মাধবঃ ‖ ৪৬ ||
তাভিঃ প্রসন্নচিত্তাভির্গোপীভিঃ সহ সাদরম্।

ররাম রাসগোষ্ঠীভিরুদার-চরিতো হরিঃ ‖ ৪৭ ||
রাসমণ্ডল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপার্শ্বমনুজ্ঝতা।
গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনা ‖ ৪৮ ||
হস্তে প্রগৃহ্য চৈকৈকাং গোপিকাং রাসমণ্ডলীম্।
চকার তৎকরস্পর্শনিমীলিতদৃশাং হরিঃ ‖ ৪৯ ||
ততঃ স ববৃতে রাসশ্চলদ্বলয়নিস্বনঃ।
অনুযাতশরৎকাব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাৎ ‖ ৫০ ||
কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরম্।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ‖ ৫১ ||
পরিবর্তশ্রমেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ‖ ৫২ ||
কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।
গোপী গীতস্তুতিব্যাজ-নিপুণা মধুসূদনম্ ‖ ৫৩ ||
গোপীকপোলসংশ্লেষমভিপত্য হরের্ভুজৌ।
পুলকোদ্গামশস্যায় স্বেদাম্বু ঘনতাং গতৌ ‖ ৫৪ ||
রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবৎ তারতধ্বনিঃ।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবৎ তা দ্বিগুণং জগুঃ ‖ ৫৫ ||
গতে তু গমনং চক্রুর্বলনে সংমুখং যযুঃ।
প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিম্ ‖ ৫৬ ||
স তথা সহ গোপীভী ররাম মধুসূদনঃ।
যথাব্দকোটিপ্রমিতঃ ক্ষণস্তেন বিনাভবৎ ‖ ৫৭ ||
তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়াঃ ‖ ৫৮ ||
সোহপি কৈশোরকবয়ো মানয়ন্ মধুসূদনঃ।
রেমে তাভিরমেয়াত্মা ক্ষপাসু ক্ষপিতাহিতঃ || ” ৫৯ ||

বিষ্ণুপুরাণম্ পঞ্চমাংশ, ১৩ অঃ

"নির্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চন্দ্রিকা, ফুল্লকুমুদিনী, দিক্ সকল গন্ধামোদিত, ভৃঙ্গমালাশব্দে বনরাজি মনোরম দেখিয়া, কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস করিলেন। বলরামের সহিত সৌরি অতীব মধুর স্ত্রীজনপ্রিয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত অস্ফুটপদ সঙ্গীত গান করিলেন। রম্য গীতধ্বনি শুনিয়া তখন গৃহপরিত্যাগপূর্বক যথা মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোপীগণ ত্বরান্বিতা হইয়া আসিল। কোন গোপী তাঁহার লয়ানুগমনপূর্বক ধীরে ধীরে গায়িতে লাগিল। কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে স্মরণপূর্বক তাঁহাতে একমনা হইল। কেহ বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া লজ্জিতা হইল। কেহ বা লজ্জাহীনা ও প্রেমান্ধা হইয়া তাঁহার পার্শ্বে আসিল। কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে দেখিয়া নিমীলিতলোচনা হইয়া গোবিন্দকে তন্ময়ত্বের সহিত ধ্যান করিতে লাগিল। অন্যা গোপকন্যা কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাহ্লাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্তিহেতু যে মহাদুঃখ, তদ্দারা তাহার অশেষ পাতক বিলীন হইলে, পরব্রহ্মস্বরূপ জগৎকারণকে চিন্তা করিয়া পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেতু মুক্তিলাভ করিল। গোবিন্দ শরচ্চন্দ্র মনোরম রাত্রিতে গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্ভরসে[1] সমুৎসুক হইলেন। কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে গোপীগণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া দলে দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং কৃষ্ণে নিরুদ্ধহৃদয়া হইয়া পরস্পরকে এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই ললিতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।' অন্যা বলিল, 'আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর।' অপরা বলিল 'দুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, আমি কৃষ্ণ,' এবং বাহু আস্ফোটন-পূর্বক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ বলিল, 'হে গোপগণ! তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, আমি এইখানে গোবর্ধন ধরিয়া আছি।' অন্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী বলিল, 'এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর।' এইরূপে সেই সকল গোপী তৎকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুবর্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাঙ্গনা গোপী ভূমি দেখিয়া সর্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোৎপল বিকশিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'হে সখি! দেখ, এই ধ্বজব্রজাঙ্কুশরেখাবন্ত পদচিহ্নসকল

লীলালঙ্কৃতগামী কৃষ্ণের। কোন পুণ্যবতী মদালসা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহারই এই সকল ঘন এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি! সেই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পদচিহ্নের অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ পুষ্পসকল অবচিত করিয়াছেন। তিনি কোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পুষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সে জন্মান্তরে সর্বাত্মা বিষ্ণুকে অর্চিত করিয়া থাকিবে। পুষ্পবন্ধনসম্মানে সে গর্বিতা হইয়া থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপসুত এই পথে গমন করিয়াছেন দেখ। আর এই পাদাগ্রচিহ্ন সকলের নিম্নতা দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতম্বভারমন্থরা কেহ তাঁহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের চেষ্টা করিয়াছিল। হে সখি, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দেখিয়া বোধ হইতেছে যে, সেই অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তিনি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে হস্তসংস্পর্শ পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল; কেন না, এ পদচিহ্ন দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্যহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হইয়াছিল। আর সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট পুনর্বার আসিতেছি। সেই জন্য ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বরিত হইয়াছে। এখন গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, কেন না, আর পদচিহ্ন দেখা যায় না। এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া যাই।”

“অনন্তর গোপীগণ দেখিল, বিকশিতমুখপঙ্কজ ত্রৈলোক্যের রক্ষাকর্তা অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণ আসিলেন। কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া অত্যন্ত হর্ষিত হইয়া কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। কোন গোপী ললাটফলকে ভ্রূভঙ্গ করিয়া, হরিকে দেখিয়া, তাঁহারা মুখপঙ্কজ নেত্রভৃঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান করিতে লাগিল। কেহ গোবিন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারূঢ়ার ন্যায় শোভিত হইয়া তাঁহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নীয় বিবেচনায় কাহাকে বা প্রিয়ালাপের দ্বারা, কাহাকে বা ভ্রূভঙ্গবীক্ষণের দ্বারা কাহাকে বা করস্পর্শের দ্বারা সান্ত্বনা করিলেন। পরে উদারচরিত হরি প্রসন্নচিত্তা গোপীদিগের সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষ্ণের পার্শ্ব ছাড়ে না, এক স্থানে স্থির থাকে, এজন্য সেই গোপীদিগের সহিত রাসমণ্ডলবন্ধও হইল না। পরে একে একে গোপীদিগকে

হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাঁহার করস্পর্শে নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃষ্ণ রাসমণ্ডলী প্রস্তুত করিলেন। অতঃপর গোপীদিগের চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোপীগণগীত শরৎকাব্যগানের দ্বারা অনুযাত রাসক্রীড়ায় তিনি প্রবৃত্ত হইলেন। কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান করিলেন। গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্ণনামই গায়িতে লাগিল। এক গোপী নর্তনজনিত শ্রমে শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বনিবিশিষ্ট বাহুলতা মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত করিল। কপটতায় নিপুণা কোন গোপী কৃষ্ণগীতের স্তুতিচ্ছলে বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মধুসূদনকে চুম্বিত করিল। কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংশ্লেষপ্রাপ্ত হইয়া পুলকোদ্গামরূপ শস্যোৎপাদনের জন্য স্বেদাম্বুমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তরতর ধ্বনিতে কৃষ্ণ যাবৎকাল রাসগীত গায়িতে লাগিলেন, তাবৎকাল গোপীগণ 'সাধু কৃষ্ণ, সাধু কৃষ্ণ' বলিয়া দ্বিগুণ গায়িল। কৃষ্ণ গেলে তাহারা গমন করিতে লাগিল, কৃষ্ণ আবর্তন করিলে তাহারা সম্মুখে আসিতে লাগিল, এইরূপ প্রতিলোম অনুলোম গতির দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজনা করিল। মধুসূদন গোপীদিগের সহিত সেইখানে ক্রীড়া করিলেন। তাহারা তাঁহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বৎসর মনে করিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল। শত্রুধ্বংসকারী অমেয়াত্মা মধুসূদনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন।"

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, "রম্"-ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি ক্রীড়ার্থে "রম" ধাতু বুঝিয়াছি; যথা, "রতিপ্রিয়া" অর্থে আমি 'ক্রিড়ানুরাগিণী' বুঝিয়াছি। আদৌ "রম্" ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহৃত। উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা ক্রীড়ার্থ হইতেই পশ্চাৎ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'রতি' ও 'রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে যে কৃষ্ণলীলায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে। পাঠক হরিবংশের সপ্তষষ্টিতম পুস্তকান্তরে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায় এইরূপ প্রয়োগ দেখিবেন।[2] তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগণকে 'রতিপ্রিয়' গোপাল বলা হইয়াছে। আর এই অর্থই এখানে সঙ্গত, কেন না, 'রাস' একটি ক্রীড়াবিশেষ। অদ্যাপি ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে ঐরূপ

ক্রীড়া বা নৃত্য প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ কি, তাহা শ্রীধর স্বামী বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন–

“অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদা রাসো নাম।”

অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে পরস্পরের হাত ধরিয়া গায়িতে গায়িতে এবং মণ্ডলীরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস। বালকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশবিশেষে এরূপ নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই।

‘রাস’ একটা খেলা, এবং ‘রতি’ শব্দে খেলা। অতএব রাসবর্ণনে ‘রতি’ শব্দ ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তৎপ্রতিশব্দস্বরূপ ‘ক্রীড়া’ শব্দই ব্যবহার করিতে হয়।

এই রাসলীলাবৃত্তান্ত কিয়ৎপরিমাণে দুর্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গূঢ় তাৎপর্য আছে, তাহা আমি গ্রন্থাকারে পরিস্ফুট করিয়াছি। কিন্তু এখানে এ তত্ত্ব অসম্পূর্ণ রাখা অনুচিত, এজন্য যাহা বলিয়াছি, তাহা পুনরুক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি।

আমি “ধর্মতত্ত্ব” গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম। সেই মনুষ্যত্ব বা ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতা। সেই বৃত্তিগুলিকে শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি। যে সকল বৃত্তির দ্বারা সৌন্দর্যাদির পর্যালোচনা করিয়া আমরা নির্মল এবং অতুলনীয় আনন্দ অনুভূব করি, সেই সকলের নাম দিয়াছি চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি। তাহার সম্যক্ অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগৎ এবং জগন্ময় সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভূতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধর্মের হানি হয়। যিনি আদর্শ মনুষ্য, তাঁহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা স্ফূর্তিহীন থাকিবার সম্ভাবনা নাই। এই রাসলীলায় কৃষ্ণ এবং গোপীগণকৃত সেই চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ।

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্তু গোপীপক্ষে ইহা ঈশ্বরোপাসনা। এক দিকে অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যবিকাশ, আর এক দিকে অনন্তসুন্দরের উপাসনা। চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃত্তিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা। প্রাচীন ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ

নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। স্ত্রীলোকের পক্ষে কর্মমার্গ কষ্টসাধ্য, কিন্তু ভক্তিতে তাদের বিশেষ অধিকার। ভক্তি, কথিত হইয়াছে, “পরানুরক্তিরীশ্বরে”। অনুরাগ নানা কারণে জন্মিতে পারে। কিন্তু সৌন্দর্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনুষ্যে সর্বাপেক্ষা বলবান্। অতএব অনন্তসুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জীবনসার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্ত্বাত্মক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্যই তাহাতে বর্তমান। শরৎকালের পূর্ণচন্দ্র, শরৎপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্যামলসলিলা যমুনা, প্রস্ফুটিতকুসুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকূজিত বৃন্দাবন-বনস্থলী, এবং তন্মধ্যে অনন্তসুন্দরের স্বশরীরে বিকাশ। তাহার সহায় বিশ্ববিমোহিনী কৃষ্ণগীতি। এইরূপ সর্বপ্রকার চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া আপনাদিগকেই কৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, এবং কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগিণী হইয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল।

ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক যুবতী একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা আমাদিগের আধুনিক সমাজে নিন্দনীয়। অন্যান্য সমাজে—যথা ইউরোপে—নিন্দোনীয় নহে। বোধ হয়, যখন বিষ্ণুপুরাণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কার্যটা নিন্দনীয়। সেই জন্যই তিনি লিখিয়া থাকিবেন যে,—

“তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।”

এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোষক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,—

“তদ্ভর্তৃষু তথা তাসু সর্বভুতেষু চেশ্বরঃ।
আত্মস্বরূপরূপোহসৌ রাপ্য বায়ুরিব স্থিতঃ ||
যথা সমস্তভূতেষু নভোহগ্নিঃ পৃথিবী জলম্।
বায়ুশ্চাত্মা তথৈবাসৌ বাপ্য সর্বমবস্থিতঃ || ”

তিনি তাহাদিগের ভর্তৃগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভূতেতে, ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপরূপে সকলেই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন। যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, জল এবং বায়ু, তেমনি তিনিই সর্বভূতে আছেন।

এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। যুবক যুবতীর একত্রে নৃত্য করায় ধর্মতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের সময়ে, বোধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না।

----

1 রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ :-"অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মণ্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো" নাম ইতি শ্রীধরঃ।

2 "স তত্র বয়সা তুল্যৈর্বৎসপালৈঃ সহানঘঃ।
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণঃ পুরা স্বর্গগতো যথা ||
তং ক্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষ্ণং ভাণ্ডীরবাসিনম্।
রময়ন্তি স্ম বহবো বন্যৈঃ ক্রীড়নকৈস্তদা ||
অন্যে স্ম পরিগায়ন্তি গোপামুদিতমানসাঃ।
গোপালাঃ কৃষ্ণমেবান্যে গায়ন্তি স্ম রতিপ্রিয়া || "

এই তিন শ্লোকে "রম্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ তিন বার ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা "রেমে", "রময়ন্তি", "রতিপ্রিয়া"; তিন বারই ক্রীড়ার্থে, অর্থান্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন না, গোপালদিগের কথা হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী।

হরিবংশ

বিষ্ণুপুরাণ হইতে পূর্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে। ঐ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপুরাণে আর কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাঁহাদের খেদোক্তি আছে।

সেইরূপ হরিবংশেও ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ণুপর্বের ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থান্তরে ৭৬ অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই। যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু উদ্ধৃত করিবার আগে বক্তব্য সে, "রাস" শব্দ হরিবংশে ব্যবহৃত হয় নাই। তৎপরিবর্তে "হল্লীষ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের নাম "হল্লীষক্রীড়নম্"। যথা "ইতি শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্বণি হল্লীষক্রীড়নে সপ্তসপ্ততোহধ্যায়।" হেমচন্দ্রাভিধানে, "হল্লীষ" অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে–

"মণ্ডলেন তু যন্নৃত্যং স্ত্রীণাং হল্লীষকন্তু তৎ।"

বাচস্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন–

"স্ত্রীণাং মণ্ডলিকাকারনৃত্যে।"

অতএব 'হল্লীষ' এবং 'রাস' একই কথা–নৃত্যবিশেষ।

এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি।

"কৃষ্ণস্তু যৌবনং দৃষ্টা নিশি চন্দ্রমসো নবং।
শারদীঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রতিস্প্রতি ‖
স করীষাঙ্গরাগাসু ব্রজরথ্যাসু বীর্যবান।
বৃষাণাং জাতদর্পাণাং যুদ্ধানি সমযোজয়ৎ ‖
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্ যোধয়ামাস বীর্যবান্।
বনে স বীরো গাশ্চৈব জগ্রাহ গ্রাহবদ্বিভুঃ ‖
যুবতীর্গোপকন্যাশ্চ রাত্রৌ সঙ্কাল্য কালবিৎ।

কৈশোরকং মানয়ন্ বৈ সহ তাভির্মুমোদ হ ॥
তাস্তস্য বদনং কান্তং কান্তা গোপস্ত্রিয়ো নিশি।
পিবিন্তি নয়নাক্ষেপৈর্গাঙ্গতং শশিনং যথা ॥
হরিতালার্দ্রপীতেন সকৌষেয়েন বাসসা।
বসানো ভদ্রবসনং কৃষ্ণঃ কান্ততরোহভবৎ ॥
স বৃদ্ধাঙ্গদনির্যুহশ্চিত্রয়া বনমালয়া।
শোভামানো হি গোবিন্দঃ শোভয়ামাস তং ব্রজং ॥
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাহব্রুবন্।
বিচিত্রং চরিতং ঘোষে দৃষ্টা তত্তস্য ভাসতঃ ॥
তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।
ভ্রামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈর্নিরৈক্ষন্ত বরাঙ্গনাঃ ॥
তা বার্যৎমাণাঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥
তাস্ত পংক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমং।
গায়ন্ত্য কৃষ্ণচরিতং দ্বন্দ্বশো গোপকন্যকাঃ ॥
কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ণপ্রণিহিতেক্ষণাঃ।
কৃষ্ণস্য গতিগামিন্যস্তরুণ্যস্তা বরাঙ্গনাঃ ॥
বনেষু তালহস্তাগ্রৈঃ কুট্টয়ন্তস্তথাহপরাঃ।
চেরুর্বৈ চরিতং তস্য কৃষ্ণস্য ব্রজযোষিতঃ ॥
তাস্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিলাসস্মিতবীক্ষত্ম।
মুদিতাশ্চানুকুর্বন্ত্যঃ ক্রীড়ন্ত্যো ব্রজযোষিতঃ ॥
ভাবনিস্যন্দমধুরং গায়ন্ত্যস্তা বরাঙ্গনাঃ।
ব্রজং গতাঃ সুখং চেরুর্দামোদরপরায়ণাঃ ॥
করীষপাংশুদিগ্ধাঙ্গাস্তাঃ কৃষ্ণমনুবব্রিরে।
রময়ন্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমত্তং করেণবঃ ॥

তমন্যা ভাববিকচৈর্নৈত্রৈঃ প্রহসিতাননাঃ।
পিবন্ত্যতৃপ্তা বনিতাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণমৃগেক্ষণাঃ ||
মুখমস্যাব্জসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ।
রত্যন্তরগতা রাত্রৌ পিবন্তি রতিলালসাঃ ||
হাহেতি কুর্বতস্তস্য প্রহৃষ্টাস্তা বরাঙ্গনাঃ।
জগৃহুর্নিঃসৃতাং বাণীং সাম্না দামোদরেরিতাং ||
তাসাং গ্রথিতসীমন্তা রতিশ্রান্ত্যাকুলীকৃতাঃ।
চারু বিস্রংসিরে কেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোষিতাম্ ||
এবং স কৃষ্ণো গোপীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীষু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সুখী || ”
—হরিবংশে, ৭৭, অধ্যায়

“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন (বিকাশ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদীয়া নিশা দেখিয়া ক্রীড়াভিলাষী হইলেন। কখনও ব্রজের শুষ্কগোময়াকীর্ণ রাজপথে জাতদর্প বৃষগণকে বীর্যবান্ কৃষ্ণ যুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গোপালগণকে যুদ্ধ করাইতেন, এবং কুম্ভীরের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ করিতেন। কালজ্ঞ কৃষ্ণ আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণীত করিয়া রাত্রে তাহাদিগের সহিত আনন্দানুভাব করিলেন। সেই গোপসুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা ধরাগত চন্দ্রের মত তাঁহার সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল। সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্দ্র পীত কৌষেয় বসন পরিহিত হইয়া কান্ততর হইলেন। অঙ্গদসমূহ ধারণপূর্বক বিচিত্র বনমালা দ্বারা শোভিত হইয়া গোবিন্দ সেই ব্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন। সেই বাক্যালাপী কৃষ্ণের বিচিত্র চরিত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোপকন্যাগণ তখন তাঁহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরস্থিতিহেতু ঊর্দ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত করিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামিত-চক্ষু বদনের দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাতা কর্তৃক নিবারিত হইয়াও রাত্রে কৃষ্ণের নিকটে গমন করিল। তাহারা সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাজিয়া, মনোহর ক্রীড়া করিল; এবং যুগ্মে যুগ্মে কৃষ্ণচরিত গান করিল। বরাঙ্গনা তরুণীগণ

কৃষ্ণলীলানুকারিণী, কৃষ্ণে প্রণিহিতলোচনা; এবং কৃষ্ণের গমনানুগামিনী হইল। কোন কোন ব্রজবালা হস্তাগ্রে তালকুট্টনপূর্বক কৃষ্ণচরিত আচরিত করিতে লাগিল। ব্রজযোষিদ্‌গণ, কৃষ্ণের নৃত্য, গীত, বিলাসস্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্বক, সানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কৃষ্ণপরায়ণা বরাঙ্গনাগণ ভাবনিস্যন্দমধুর গান করতঃ ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ করিতে লাগিল। সম্প্রমত্ত হস্তীকে করেণুগণ যেরূপ ক্রীড়া করায়, শুষ্ক গোময় দ্বারা দিগ্ধাঙ্গ সেই গোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্তন করিল। সহাস্যবদনা কৃষ্ণমৃগলোচনা অন্য বনিতাগণ ভাবোৎফুল্ল লোচনের দ্বারা কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়া পান করিতে লাগিল। ক্রীড়ালালসাতৃষিতা গোপকন্যাগণ রাত্রিতে অনন্যক্রীড়াসক্ত হইয়া অব্জসঙ্কাশ কৃষ্ণমুখমণ্ডল পান করিতে লাগিল। কৃষ্ণ হা হা ইতি শব্দ করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখনিঃসৃত সেই বাক্য, বরাঙ্গনাগণ আহ্লাদিত হইয়া গ্রহণ করিল। সেই গোপযোষিদ্গণের ক্রীড়াশ্রান্তিপ্রযুক্ত আকুলীকৃত সীমন্তগ্রথিত কেশদাম কুচাগ্রে বিস্রস্ত হইতে লাগিল। চক্রবালালঙ্কৃত শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ সচন্দ্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের সহিত আনন্দ করিতে লাগিলেন।”

বিষ্ণুপুরাণ হইতে রাসলীলাতত্ত্ব অনুবাদ কালে ‘রম্’ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্দ সকলের যেরূপ ক্রীড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি; এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে ঐ সকল শব্দের ক্রীড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়াছি। জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, অন্য কোনরূপ প্রতিশব্দ ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা–

“তাস্তু পংক্তীকৃতাঃ সর্বা রময়ন্তি মনোরমম্।”

এখানে ক্রীড়ার্থে ভিন্ন রত্যর্থে ‘রময়ন্তি’ শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাঁহার অনুরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্বপ্রচলিত কুসংস্কারবশতঃই করিয়াছেন।

এই হল্লীষক্রীড়াবর্ণনা বিষ্ণুপুরাণকৃত রাসবর্ণনার অনুগামী। এমন কি, এক একটি শ্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই। যথা, বিষ্ণুপুরাণে আধে –

“তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গানা রাত্রৌ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ || ”

হরিবংশে আছে–

“তা বার্যমাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভির্মাতৃভিস্তথা।
কৃষ্ণং গোপাঙ্গনা রাত্রৌ রময়ন্তি রতিপ্রিয়া || ”

তবে বিষ্ণুপুরাণের অপেক্ষা হরিবংশের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত। অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষ্ণুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নূতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। হরিবংশে রাসলীলার এইরূপ সংক্ষেপ বর্ণনার একটু কারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিত্বে, গাম্ভীর্যে, পাণ্ডিত্যে এবং ঔদার্যে হরিবংশকার বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষা অনেক লঘু। তিনি বিষ্ণুপুরাণের রাসবর্ণনার নিগূঢ় তাৎপর্য এবং গোপীগণকৃত ভক্তিযোগ দ্বারা কৃষ্ণে একাত্মতা প্রাপ্তি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা না বুঝিতে পারিয়াই সেখানে বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন,–

“কাচিৎ প্রবিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্য চুচুম্ব তম্।”

সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন,

“তাস্তং পয়োধরোত্তানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্।” ইত্যাদি

প্রভেদটুকু এই যে, বিষ্ণুপুরাণের চপলা বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের এই গোপীগণ বিলাসিনীর ভাব প্রকাশ করিতেছে। হরিবংশকারের অনেক স্থলে বিলাসপ্রিয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায়।

আর আর কথা বিষ্ণুপুরাণে রাসলীলা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হরিবংশের এই হল্লীষক্রীড়া সম্বন্ধেও বর্তে।

উপরিলিখিত শ্লোকগুলি ভিন্ন হরিবংশে ব্রজগোপীদের সম্বন্ধে আর কিছুই নাই।

www.bengaliebook.com

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ব্রজ গোপী-ভাগবত

বস্ত্রহরণ

শ্রীমদ্ভাগবতে ব্রজগোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের সহিত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তাহা আধুনিক রুচির বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহ্যদৃশ্য এখনকার রুচিবিগর্হিত হইলেও অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকার বিলাস-প্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় অতিশয় নিগূঢ় এবং অতিশয় বিশুদ্ধ।

দশম স্কন্ধের ২১ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়া পরস্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত করিতেছে। সেই পূর্বানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তার পর তাহা স্পষ্টীকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। সেই উপন্যাস "বস্ত্রহরণ" বলিয়া প্রসিদ্ধ। বস্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ণুপুরাণে বা হরিবংশে নাই, সুতরাং উহা ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। বৃত্তান্তটা আধুনিক রুচিবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, কেন না, ভাগবতব্যাখ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলীলার সঙ্গে ইহার বিশেষ সম্বন্ধ।

কৃষ্ণানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে পতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নীব্রত করিল। ব্রতের নিয়ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া প্রত্যূষে যমুনাসলিলে অবগাহন করিত। স্ত্রীলোকদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা কুৎসিত প্রথা এ কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোকেরা অবগাহনকালে নদীতীরে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জলমগ্না হয়। সেই প্রথানুসারে এই

ব্রজাঙ্গনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন করিত। মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা ঐরূপ করিল। তাহাদের কর্মফল (উভয়ার্থে) দিবার জন্য সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তীরস্থ কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন।

গোপীগণ বড় বিপন্না হইল। তাহারা বিনাবস্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায়। তাহারা কণ্ঠ পর্যন্ত নিমগ্ন হইয়া, শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে, কৃষ্ণের নিকট বস্ত্রভিক্ষা করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন না–গোপীদিগের "কর্মফল" দিবার ইচ্ছা আছে। তার পর যাহা ঘটিল, তাহা আমরা স্ত্রীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গালা ভাষায় কোন মতেই প্রকাশ করিতে পারি না। অতএব মূল সংস্কৃতই বিনানুবাদে উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণকে বলিতে লাগিল;–

মহিনয়ং ভো কৃথাস্ত্বান্ত নন্দগোপসুতং প্রিয়ম্।
জানীমোহঙ্গ ব্রজশ্লাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ ||
শ্যামসুন্দর তে দাস্য করবাম তবোদিতম্।
দেহি বাসাংসি ধর্মজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবাম হে ||
শ্রীভগবানুবাচ।
ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়োক্তঞ্চ করিষ্যথ।
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছত শুচিস্মিতাঃ।
নোচেন্নাহং প্রদাস্যে কিং ক্রুদ্ধো রাজা করিষ্যতি ||
ততো জলাশয়ায়ৎ সর্বা দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ।
পাণিভ্যাং * * আচ্ছাদ্য প্রোক্তেরুঃ শীতকর্ষিতাঃ ||
ভগবানাহ তা বীক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ।
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাচ সস্মিতম্ ||
যূয়ং বিবস্ত্রা যদপো ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্তদু দেবহেলম্।
বদ্ধাঞ্জলিং মূদ্ধর্ণ্যপনুত্তয়েহংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহ্যতাম্ ||

ইত্যচ্যুতেনাভিহিতং ব্রজবালা নত্বা বিবস্ত্রাপ্লবনং ব্রতচ্যুতিম্।
তৎপূর্তিকামাস্তদশেষকর্মণাং সাক্ষাৎকৃতং নেমুরবদ্যমৃগ্ যতঃ ‖
তাস্তথাবনতা দৃষ্ট্বা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বাসাংসি তাভ্যঃ প্রাযচ্ছৎ করুণস্তেন তোষিতঃ ‖
শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ম স্কন্দঃ, ২২ অধ্যায়।

অন্তনির্হিত ভক্তিতত্ত্বটা এই। ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বারা পাইবার প্রধান সাধনা, ঈশ্বরে সর্বার্পণ। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন–

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ || "

গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বার্পণ করিল। স্ত্রীলোক, যখন সকল পরিত্যাগ করিতে পারে, তখনও লজ্জা ত্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম কর্ম ভাগ্য–সব যায়, তথাপি স্ত্রীলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জা স্ত্রীলোকের শেষ রত্ন। যে স্ত্রীলোক, অপরের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল। এই স্ত্রীগণ শ্রীকৃষ্ণে লজ্জাও অর্পিত করিল। এ কামাতুরার লজ্জার্পণ নহে–লজ্জাবিবশার লজ্জার্পণ। অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্বস্বার্পণ করিল। কৃষ্ণও তাহা ভক্ত্যুপহার বলিয়া গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, তাহাদের কামনা কামার্থে কল্পিত হয় না। যব ভর্জিত এবং ক্বাথিত হইলে, বীজত্বে সমর্থ হয় না।" অর্থাৎ যাহারা কৃষ্ণকামিনী, তাহাদিগের কামাবশেষ হয়। আরও বলিলেন, "তোমরা যে জন্য ব্রত করিয়াছ, আমি তাহা রাত্রে সিদ্ধ করিব।"

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাপূরণ করিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপস্থিত। এই গোপাঙ্গনাগণ পরপত্নী, তাহাদের পতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারাভিমর্ষণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ পাপারোপণ কেন?

ইহার উত্তর আমার পক্ষে অতি সহজ। আমি ভূরি ভূরি প্রমাণের দ্বারা বুঝিয়াছি যে, এ সকল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্যতা নাই। কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পরিক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শুকমুখে একটা

উত্তর দিয়াছেন। যথাস্থানে তাহার কথা বলিব। কিন্তু আমাকেও এখানে বলিতে হইবে যে, হিন্দুধর্মের ভক্তিবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই গোপীগণপতিত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ নিজে বলিয়াছেন,–

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

"যে, যে ভাবে আমাকে ভজনা করে, "আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ করি।" অর্থাৎ যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দেবমাতা অদিতি কৃষ্ণ(বিষ্ণু)কে বলিতেছেন যে, আমি তোমাকে তোমাকে পুত্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, বসুদেব দেবকী জগদীশ্বরকে পুত্রভাবে কামনা করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পুত্রভাবে পাইয়াছেন। অতএব গোপীগণ তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার জন্য যথোপযুক্ত সাধনা করিয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকে তাহারা পতিভাবে পাইল।

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্ম কি? ঈশ্বর প্রাপ্তিতে অধর্ম আবার কি? পাপের দ্বারা, পুণ্যময়, পুণ্যের আদিভূত স্বরূপ জগদীশ্বরকে কি পাওয়া যায়? পাপ-পুণ্য কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সন্নিধি উপস্থিত হইতে পারি, তাহাই পুণ্য–তাহাই ধর্ম, তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ–তাহাই অধর্ম।

পুরাণকার এই তত্ত্ব বিশদ করিবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই। তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃষ্ণকে কামনা না করিয়া উপপতিভাবে তাঁহাকে কামনা করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে সশরীরে পাইল না; তাহাদের পতিগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা প্রাণত্যাগ করিল।

"তমেব পরমাত্মানাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।

জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনা : ||" ১০।২৯।১০

কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই তাহারা কৃষ্ণকে উপপতি ভাবিল। কিন্তু অন্য পতি স্মৃতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনন্যচিন্তা হইতে পারিল না। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাপ্তির অধিকারিণী হইল না। যতক্ষণ জারবুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপবুদ্ধি থাকিবে, কেন না, জারানুগমন পাপ। যতক্ষণ জারবুদ্ধি

থাকিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না—কেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না—ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামনা মাত্র। ঈদৃশী গোপী কৃষ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃষ্ণকে পাইতে অযোগ্যা।

অতএব এই পতিভাবে জগদীশ্বরকে পাইবার কামনায় গোপীদিগের পাপমাত্র রহিল না। গোপীদিগের রহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষ্ণুপুরাণকার যাহা বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন। ঈশ্বরের আবার পাপপূণ্য কি? তিনি আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরী ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা বা তজ্জনিত দোষ ঘটে না। তিনি সর্বভূতে আছেন, গোপীগণেও আছেন, গোপীগণের স্বামীতেও আছেন। তাঁহার কর্তৃক পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে না।

এ কথায় আমাদের একটা আপত্তি আছে। ঈশ্বর এখানে শরীরী, এবং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট। যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানবধর্মাবলম্বী হইয়া কার্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ করিয়াছেন। মানবধর্মীর পক্ষে গোপবধূগণ পরস্ত্রী, এবং তদভিগমন পরদারপাপ। কৃষ্ণই গীতায় বলিয়াছেন, লোকশিক্ষার্থ তিনি কর্ম করিয়া থাকেন। লোকশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপচারী ও পাপের শিক্ষক হইলেন। অতএব পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন খাটে না। এইরূপ দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই। ভাগবতকার নিজেই কৃষ্ণকে এই রাসমণ্ডলমধ্যে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ||
শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১০ স্ক, ৩৩ অঃ, ২৬

তবে, বিষ্ণুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতকার প্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্ত্বের পারদর্শিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ। স্ত্রীজাতী, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বস্তু বলিয়া জানে; যে স্ত্রী, জগদীশ্বরে পরমভক্তিমতী, সে সেই পতিভাবেই তাঁহাকে পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিল—ইংরেজি পড়িয়া আমরা যাই বলি—কথাটা অতি রমণীয়!—ইহাতে কত মনুষ্যহৃদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্যগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। তারপর যে

পতিভাবে তাঁহাকে দেখিল, সেই পাইল,–যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে পাইল না, একথাও ভক্তির ঐকান্তিকতা বুঝাইবার কি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু আর একটা কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত করিয়াছেন। পতিত্বে একটা ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ আছে। কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ভাগবতোক্ত রাসবর্ণনের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, বিষ্ণুপুরাণের ও হরিবংশের রাসের ন্যায় কেবল নৃত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপর্দীর রোষানলে ভস্মীভূত, সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুনর্জীবনার্থ ধূমিত। অনঙ্গ এখানে প্রবেশ করিয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য নয়; ঈশ্বরপ্রাপ্তিজনিত মুক্ত জীবের যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া, তাহাই পরিস্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাঁহার রোপিত ভগবদ্ভক্তিপঙ্কজের মূল, অতল জলে ডুবিয়া রহিল–উপরে কেবল বিকশিত কুসুমদামের ভাসিতে লাগিল। যাহারা উপরে ভাসে–তলায় না, তাহারা কেবল সেই কুসুমদামের মালা গাঁথিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল। যাহা ভাগবতে নিগূঢ় ভক্তিতত্ত্ব, জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা মদনধর্মোৎসব। এত কাল, আমাদের জন্মভূমি সেই মদনধর্মোৎসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্ণচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইয়াছে। কৃষ্ণচরিত্র, বিশুদ্ধিতায়, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার ন্যায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত করিলেও লোকে তাহা শুনিবে, তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী-ভাগবত

ব্রাহ্মাণকন্যা

বস্ত্রহরণের নিগূঢ় তাৎপর্য আমি যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাকি আছে।

“যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ||

ইতি বাক্যের অনুবর্তী হইয়া যে জগদীশ্বরে সর্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে পাইবার অধিকারী হয়। বস্ত্রহরণকালে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণে সর্বস্বার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল। আর একটি উপন্যাস রচনা করিয়া ভাগবতকার এই তত্ত্ব আরও পরিষ্কৃত করিয়াছেন। সে উপন্যাস এই,–

একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট আহার্য প্রার্থনা করিল। অদূরবর্তী কোন স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিতেছিলেন। কৃষ্ণ গোপালগণকে উপদেশ করিলেন যে, সেইখানে গিয়া আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা যজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাহিল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে কিছু না দিয়া তাড়াইয়া দিল। গোপালগণ কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সেই সকল কথা জানাইল। কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্বার যজ্ঞস্থলে গিয়া অন্তঃপুরবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম করিয়া অন্নভিক্ষা চাও। গোপালেরা তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালদিগকে প্রভূত অন্নব্যঞ্জন প্রদান করিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়া তাঁহার দর্শনে আসিল। তাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণকে দর্শন করিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি করিলেন। ব্রাহ্মণকন্যাগণ বলিলেন, “আমরা আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি–তাঁহারা আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা আপনার পদাগ্রে পতিত হইতেছি, আমাদিগের অন্যা গতি আপনি বিধান করুন।” কৃষ্ণ

তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন না, বলিলেন, "দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে। তোমরা আমাতে চিত্ত নিবিষ্ট কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান, অনুকীর্তনে আমাকে পাইবে—সন্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে ফিরিয়া যাও।" তাহারা ফিরিয়া গেল।

এখন এই ব্রাহ্মণকন্যাগণ কৃষ্ণকে পাইবার যোগ্য কি করিয়াছিলেন? কেবলমাত্র পিত্রাদি স্বজন ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা করিয়া থাকে। ভগবানে সর্বস্বার্পণ তাঁহাদিগের হয় নাই, সিদ্ধ হইবার তাঁহারা অধিকারিণী হন নাই। অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির জন্য তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। পবিত্রব্রাহ্মণকুলোদ্ভূতা সাধনাভাবে যাহাতে অধিকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ তাহাতে অধিকারিণী হইল। পূর্বরাগবর্ণনস্থলে, ভাগবতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন সবিস্তারে বুঝাইয়াছেন।

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু এই রাসলীলাতত্ত্ব বস্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের কথা অতি সংক্ষেপে বলিলেই চলিবে।

নবম পরিচ্ছেদ—ব্রজগোপী-ভাগবত

রাসলীলা

ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায়ে রাসপঞ্চাধ্যায়। প্রথম অর্থাৎ ঊনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদ পূর্ণিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন করিলেন। পাঠকের স্মরণ হইবে যে, বিষ্ণুপুরাণে আছে তিনি কলপদ অর্থাৎ অস্ফুটপদ গীত করিলেন। ভাগবতকার সেই ‘কল’ শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগৌ কলম্”। টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই ‘কল’ শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের ‘ক্লীং’ শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। তিনি উহাকে কামগীত বলিয়াছেন। টীকাকারদিগের মহিমা অনন্ত! পুরাণকার স্বয়ং ঐ গীতকে ‘অনঙ্গবর্ধনম্’ বলিয়াছেন।

বংশীধ্বনি শুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাবিতা হইল। পুরাণকার তাঁহাদিগের ত্বরা এবং বিভ্রম যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কালিদাসকৃত পুরস্ত্রীগণের ত্বরা এবং বিভ্রমবর্ণনা মনে পড়ে। কে কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

গোপীগণ সমাগতা হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমাদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি করিব? ব্রজের কুশল ত? তোমরা কেন আসিয়াছ?” এই বলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই রজনী ঘোররূপা, ভীষণ পশু সকল এখানে আছে, এ স্ত্রীলোকদিগের থাকিবার যোগ্য স্থান নয়। অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মাতা পিতা পুত্র ভ্রাতা পতি তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে। বন্ধুগণের ভয়োৎপত্তির কারণ হইও না। রাকাচন্দ্রবিরঞ্জিত যমুনাসমীরণলীলাকম্পিত তরুপল্লবশোভিত কুসুমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতীগণ, অচিরে প্রতিগমন করিয়া পতিসেবা কর। বালক ও বৎস সকল কাঁদিতেছে, তাহাদিগকে দুগ্ধপান করাও। অথবা আমার প্রতি স্নেহ করিয়া, স্নেহের বশীভূতবুদ্ধি হইয়া আসিয়া থাকিবে। সকল প্রাণীই আমার প্রতি এইরূপ প্রীতি করিয়া

থাকে। কিন্তু হে কল্যাণীগণ! পতির অকপট শুশ্রূষা এবং বন্ধুগণের ও সন্তানগণের অনুপোষণ ইহাই স্ত্রীলোকদিগের প্রধান ধর্ম। পতি দুঃশীলই হউক, দুর্ভগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় লোকের মঙ্গল কামনা করে, তাহাদিগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলস্ত্রীদিগের ঔপপত্য অস্বর্গ্য, অযশস্কর, অতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বত্র নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে, অনুকীর্তনে মদ্ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্নিকর্ষে নহে। অতএব তোমরা ঘরে ফিরিয়া যাও।”

কৃষ্ণের মুখে এই উক্তি সন্নিবিষ্ট করিয়া পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিব্রত্যধর্মের মাহাত্ম্যের অনভিজ্ঞতা অথবা তৎপ্রতি অবজ্ঞাবশতঃ তিনি কৃষ্ণগোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাঁহার অভিপ্রায় পূর্বে বুঝাইয়াছি। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ঐরূপ কথা বলিয়াছিলেন। শুনিয়া তাহারা ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু গোপীগণ ফিরিল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “এমন কথা বলিও না, তোমার পাদমূলে সর্ববিষয় পরিত্যাগ করিয়াছি। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষকে পরিত্যাগ করেন না, তেমনি আমরা দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ করিও না। তুমি ধর্মজ্ঞ, পতি অপত্য সুহৃৎ প্রভৃতির অনুবর্তন স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম বলিয়া যে উপদেশ দিতেছ, তাহা তোমাতেই বর্তিত হউক। কেন না, তুমি ঈশ্বর। তুমি দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু এবং আত্মা। হে আত্মন্! যাহারা কুশলী, তাহারা, নিত্যপ্রিয় যে তুমি, সেই তোমাতেই রতি (আত্মরতি) করিয়া থাকে। দুঃখদায়ক পতিসুতাদির দ্বারা কি হইবে?” ইত্যাদি। এই সকল বাক্যে পুরাণকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল। তার পর আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্যে মুগ্ধা হইয়াই, গোপীগণ কৃষ্ণানুসারিণী। তাহার পরে পুরাণকার বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম অর্থাৎ আপনাতে ভিন্ন তাঁহার রতি বিরতি কিছুতেই নাই, তথাপি এই গোপীগণের বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি তাহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিলেন; এবং তাহাদিগের সহিত গান করতঃ যমুনাপুলিনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ কিছু নাই। যদি এ কথা প্রকৃত হইত, তাহা হইলে আমি এ রাসলীলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহা কোন রকমেই খাটিত না। কিন্তু এই কথা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি:–

“বাহুপ্রসারপরিরম্ভ-করালকোরুনীবীস্তনালভননর্মনখাগ্রপ্যতৈঃ।

ক্ষ্বেল্যাবলোলোকহসিতৈর্ব্রজসুন্দরীণামুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার || ” ৪১ ||

অন্যান্য স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। এ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া অবিধেয় হইবে।

তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ করিয়া ব্রজগোপীগণ অত্যন্ত মানিনী হইলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যমদ দেখিয়া তদুপশনমার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন। এই গেল ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

ত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্ণান্বেষণবৃত্তান্ত আছে। তাহা স্থূলতঃ বিষ্ণুপুরাণের অনুকরণ। তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল করিয়াছেন। অতএব এই অধ্যায় সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। একত্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণবিষয়ক গান করিতে করিতে তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস দুইই আছে। বুঝাইবার কথা বেশি কিছু নাই। দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবির্ভূত হইলেন। এইখানে গোপীদিগের ইন্দ্রিয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিতা উদ্ধৃত করিব।

“কাচিদঞ্জলিনাগৃহ্লাৎ তন্বী তাম্বুলচর্বিতম্।

একা তদঙ্ঘ্রিকমলং সন্তপ্তা স্তনয়োর্ন্যধাৎ || ”

এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোপীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি না। তাহার পর ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ে রাসক্রীড়া ও বিহারবর্ণন। রাসক্রীড়া বিষ্ণুপুরাণোক্ত রাসক্রীড়ার ন্যায় নৃত্যগীত মাত্র। তবে গোপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, এজন্য কিঞ্চিন্মাত্র ইন্দ্রিয়সম্বন্ধও আছে। যথা–

কস্যাশ্চিন্নাট্যবিক্ষিপ্তকুণ্ডলত্বিষমণ্ডিতম্।

গণ্ডং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্বিতম্ ‖ ১৩ ||
নৃত্যন্তী গায়তী কাচিং কূজন্নূপুরমেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়ো শিবম্ || ১৪ ||
* * *

তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলেন্দ্রিয়াঃ কেশান্ দুকূলং কুচপট্টিকাং বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢুমলং ব্রজস্ত্রিয়ো বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরূদ্বহ ‖ ১৮ ||

এইরূপ কথা ভিন্ন বেশী আর কিছু নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পুরাণকার জিতেন্দ্রিয়স্বরূপ বর্ণিত করিয়াছেন, তাহা পূর্বে বলিয়াছি এবং তাহার প্রমাণও দিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ—শ্রীরাধা

অথর্ববেদের উপনিষদ সকলের মধ্যে একখানির নাম গোপালতাপনী। কৃষ্ণের গোপমূর্তির উপাসনা ইহার বিষয়। উহার রচনা দেখিয়া বোধ হয় যে, অধিকাংশ উপনিষদ্ অপেক্ষা উহা অনেক আধুনিক। ইহাতে কৃষ্ণ যে গোপগোপীপরিবৃত তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গোপগোপীর যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহা প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন। গোপী অর্থে অবিদ্যা কলা। টীকাকার বলেন,

"গোপায়ন্তীতি গোপ্যঃ পালনশক্তয়ঃ।" আর গোপীজনবল্লভ অর্থে "গোপীনাং পালনশক্তীনাং জনঃ সমূহঃ তদ্বাচ্যা অবিদ্যাঃ কলাশ্চ তাসাং বল্লভঃ স্বামী প্রেরক ঈশ্বরঃ।"

উপনিষদে এইরূপ গোপীর অর্থ আছে, কিন্তু রাসলীলার কোন কথাই নাই। রাধার নামমাত্র নাই। এক জন প্রধানা গোপীর কথা কাছে, কিন্তু তিনি রাধা নহেন, তাঁহার নাম গান্ধর্বী। তাঁহার প্রাধান্যও কামকেলিতে নহে—তত্ত্বজিজ্ঞাসায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আর জয়দেবের কাব্যে ভিন্ন কোন প্রাচীন গ্রন্থে রাধা নাই।

ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যয়ের মধ্যে 'রাধা' নাম কোথাও পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবাচার্যদিগের অস্থিমজ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট। তাঁহারা টীকাটিপ্পনীর ভিতর পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু মূলে কোথাও রাধার নাম নাই। গোপীদিগের অনুরাগাধিক্যজনিত ঈর্ষার প্রমাণ স্বরূপ কবি লিখিয়াছেন যে, তাহারা পদচিহ্ন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, কোন এক জন গোপীকে লইয়া কৃষ্ণ বিজনে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাও গোপীদিগের ঈর্ষাজনিত ভ্রমমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলেন এই কথাই আছে, কাহাকেও লইয়া অন্তর্হিত হইলেন, এমন কথা নাই এবং রাধার নামগন্ধও নাই।

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই। ভাগবতে কেন, বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই। অথচ এখনকার কৃষ্ণ উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই। রাধা ভিন্ন এখন কৃষ্ণের

মন্দির নাই বা মূর্তি নাই। বৈষ্ণবদিগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন। যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষ্ণুপুরাণে বা ভাগবতে 'রাধা' নাই, তবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে?

রাধাকে প্রথমে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে দেখিতে পাই। উইল্‌সন্ সাহেব বলেন যে, ইহা পুরাণগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার ভট্টাচার্যদিগের রচনার মত। ইহাতে ষষ্ঠী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই পূর্বাবধি প্রসিদ্ধ যে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার। ইনি বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া দূরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষ্ণুকে সৃষ্টি করিয়াছেন। বিষ্ণু থাকেন বৈকুণ্ঠে, কৃষ্ণ থাকেন গোলোকে রাসমণ্ডলে,—বৈকুণ্ঠ তাহার অনেক নীচে। ইনি কেবল বিষ্ণুকে নহে, ব্রহ্মা, রুদ্র, লক্ষ্মী, দুর্গা প্রভৃতি সমস্ত দেবদেবী এবং জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইঁহার বাসস্থান গোলকধামে, বলিয়াছি। তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। তাহারা দেবদেবীর উপর। সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রী কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই রাধা। রাধার আগে রাসমণ্ডল, রাসমণ্ডলে ইনি রাধাকে সৃষ্টি করেন। রাসের রা, এবং ধাতুর ধা, ইহাতে রাধা নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন।[1] সেই গোপগোপীর বাসস্থান রাধাধিষ্ঠিত গোলোকধাম পূর্বকবিদিগের বর্ণিত বৃন্দাবনের বজনিশ নকল। এখনকার কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রাবলী নামে রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলকধামেও সেইরূপ বিরজা নাম্নী রাধার প্রতিযোগিনী গোপী ছিল। মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন যাত্রাওয়ালারা কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে লইয়া যায়, ইনিও তেমনি কৃষ্ণকে গোলোকধামে বিরজার কুঞ্জে লইয়া গিয়াছেন। তাহাতে যাত্রার রাধিকার যেমন ঈর্ষা ও কোপ উপস্থিত হয়, ব্রহ্মবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ ঈর্ষা ও কোপ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা কৃষ্ণকে বিরজার মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চড়িয়া বিরজার মন্দিরে গিয়া উপস্থিত। সেখানে বিরজার দ্বারবান্ ছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম। শ্রীদামা রাধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া দিল না। এ দিকে রাধিকার ভয়ে বিরজা গলিয়া জল হইয়া নদীরূপ ধারণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে দুঃখিত হইয়া

তাঁহাকে পুনর্জীবন এবং পূর্ব রূপ প্রদান করিলেন। বিরজা গোলোকনাথের সহিত অবিরত আনন্দানুভব করিতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহার সাতটি পুত্র জন্মিল। কিন্তু পুত্রগণ আনন্দানুভবের বিঘ্ন, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে অভিশপ্ত করিলেন, তাঁহারা অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, তাঁহারা সাত সমুদ্র হইয়া রহিলেন। এ দিকে রাধা, কৃষ্ণবিরজা-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া, কৃষ্ণকে অনেক ভর্ৎসনা করিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন, যে তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর। এ দিকে কৃষ্ণকিঙ্কর শ্রীদামা রাধার এই দুর্ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিলেন। শুনিয়া রাধা শ্রীদামাকে তিরস্কার করিয়া শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর। শ্রীদামাও রাধাকে শাপ দিলেন, তুমিও গিয়া পৃথিবীতে মানুষী হইয়া রায়াণপত্নী (যাত্রার আয়ান ঘোষ) এবং কলঙ্কিনী হইয়া খ্যাত হইবে।

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আসিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। শ্রীদামাকে কৃষ্ণ বর দিয়া বলিলেন যে, তুমি অসূরেশ্বর হইবে, যুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে না। শেষে শঙ্করশূলস্পর্শে মুক্ত হইবে। রাধাকেও আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, 'তুমি যাও; আমিও যাইতেছি।' শেষে পৃথিবীর ভারাবতরণ জন্য, তিনি পৃথিবীতে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

এ সকল কথা নূতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্মের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। জয়দেবাদি বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গালার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোৎসবাদির মূল ব্রহ্মবৈবর্তে। তবে ব্রহ্মবৈবর্তকারকথিত একটা বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্ণবধর্মে তাদৃশ পরিস্ফুট হয় নাই—রাধিকা রায়াণপত্নী বলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। সেই বিবাহবৃত্তান্তটি সবিস্তারে বলিতেছি, বলিবার আগে গীতগোবিন্দের প্রথম কবিতাটা পাঠকের স্মরণ করিয়া দিই।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ—
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয়।

ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ||

অর্থ। হে রাধে! আকাশ মেঘে স্নিগ্ধ হইয়াছে, তমাল দ্রুম সকলে বনভূমি অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, পথিস্থ কুঞ্জদ্রুমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকূলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক।

এ কথার অর্থ কি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে পারেন না। একজন অনুবাদকার বলিয়াছেন, "গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি কিছু অস্পষ্ট; কবি নায়ক-নায়িকার কোন্ অবস্থা মনে করিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বলা যায় না। টীকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উক্তি। তাহাতে ভাব এক প্রকার মধুর হয় বটে, কিন্তু শব্দার্থের কিছু অসঙ্গতি ঘটে।" বস্তুতঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; জয়দেব গোস্বামী ব্রহ্মবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের সূচনা স্মরণ করিয়াই এ শ্লোকটি রচনা করিয়াছেন। এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্রহ্মবৈবর্ত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি; তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বৎসর আগে পৃথিবীতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বলিয়া, রাধিকা কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন। তিনি যখন যুবতী, শ্রীকৃষ্ণ তখন শিশু।

"একদা কৃষ্ণসহিতো নন্দো বৃন্দাবনং যযৌ।
তত্রোপবনভাণ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলম্ || ১ ||
সরঃসুস্বাদুতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপৌ।
উবাস বটমূলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষসি || ২ ||
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো মায়াবালকবিগ্রহঃ।
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মুনে || ৩ ||
মেঘাবৃতং নভো দৃষ্টা শ্যামলং কাননান্তরম্।
ঝঞ্ঝাবাতং মেঘশব্দং বজ্রশব্দঞ্চ দারুণম্ || ৪ ||
বৃষ্টিধারামতিস্থূলাং কম্পমানাংশ্চ পাদপান্।
দৃষ্ট্বৈবং পতিতস্কন্ধান্ নন্দো ভয়মবাপ হ || ৫ ||

কথং যাস্যামি গোবৎসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রতি।
গৃহং যদি ন যাস্যামি ভবিতা বালকস্য কিম্ ‖ ৬ ||
এবং নন্দে প্রবদতি রুরোদ শ্রীহরিস্তদা।
মায়াভিয়া ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ‖ ৭ ||
এতস্মিন্নন্তরে রাধা জগাম কৃষ্ণসন্নিধিম্।”
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ।

অর্থ। “একদা কৃষ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাণ্ডীরবনে গোগণকে চরাইতেছিলেন। সরোবরে স্বাদু জল তাহাদিগকে পান করাইলেন, এবং পান করিলেন। এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন। হে মুনে! তার পর মায়াতে শিশুশরীরধারণকারী কৃষ্ণ অকস্মাৎ মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং কাননান্তর শ্যামল; ঝঞ্ঝাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বজ্রশব্দ, অতিস্থূল বৃষ্টিধারা, এবং বৃক্ষসকল কম্পমান হইয়া পতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন। ‘গোবৎস ছাড়িয়া কিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যদি গৃহে না যাই, তবে এই বালকেরই বা কি হইবে,’ নন্দ এইরূপ বলিতেছিলেন, শ্রীহরি তখন কাঁদিতে লাগিলেন; মায়াভয়ে ভীতযুক্ত হইয়া বাপের কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।”

রাধার অপূর্ব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বিস্মিত হইলেন, তিনি রাধাকে বলিলেন, “আমি গর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পদ্মারও অধিক হরির প্রিয়া; আর ইনি পরম নির্গুণ অচ্যুত মহাবিষ্ণু; তথাপি আমি মানব, বিষ্ণুমায়ায় মোহিত আছি। হে ভদ্রে! তোমার প্রাণনাথকে গ্রহণ কর; যথায় সুখী হও, যাও। পশ্চাৎ মনোরথ পূর্ণ করিয়া আমার পুত্র আমাকে দিও।”

এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষ্ণসমর্পণ করিলেন। রাধাও কৃষ্ণকে কোলে করিয়া লইয়া গেলেন। দূরে গেলে রাধা রাসমণ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারভূমি সৃষ্ট হইল। কৃষ্ণ সেইখানে নীত হইলে কিশোরমূর্তি ধারণ করিলেন। তিনি রাধাকে বলিলেন, “যদি গোলোকের কথা স্মরণ হয়, তবে যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ করিব।” তাঁহারা এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি

রাধাকে অনেক স্তবস্তুতি করিলেন। পরিশেষে নিজে কন্যাকর্তা হইয়া, যথাবিহিত বেদবিধি অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ করিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। রায়াণের সঙ্গে রাধিকার যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যদি হইয়া থাকে, তবে পূর্বে কি পরে হইয়াছিল, তাহা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম না। রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহারবর্ণন। বলা বাহুল্য যে, ব্রহ্মবৈবর্তের রাসলীলাও ঐরূপ।

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রহ্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নূতন বৈষ্ণবধর্ম সৃষ্ট করিয়াছেন। সে বৈষ্ণবধর্মের নামগন্ধমাত্র বিষ্ণু বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্রস্বরূপ। জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই নূতন বৈষ্ণবধর্মাবলম্বন করিয়াই গোবিন্দগীতি রচনা করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তানুসরণে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব কান্তরসাশ্রিত অভিনব ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। বলিতে গেলে, সকল কবি, সকল ঋষি, সকল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর অধিকতর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক, এই নূতন তাৎপর্য কি এবং কোথা হইতে ইহা উৎপন্ন হইল।

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য সচরাচর স্বীকৃত হয়। কিন্তু ছয়টির মধ্যে দুইটিরই প্রাধান্য বেশী—বেদান্তের ও সাঙ্খ্যের। সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ব্রহ্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্তুতঃ বেদান্তদর্শনের আদি ব্রহ্মসূত্রে নহে, উপনিষদে। উপনিষদ্‌কেও বেদান্ত বলে। উপনিষদযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই। এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। তিনি এক ছিলেন, সিসৃক্ষাপ্রযুক্ত বহু হইয়াছেন। তিনি পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশ, ঈশ্বরের মায়া হইতেই জীবাত্মা প্রাপ্ত; এবং সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে। ইহা অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্মের ভিত্তি এই বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নির্মিত। বিষ্ণু এবং বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর। বিষ্ণুপুরাণে এবং ভাগবত এবং তাদৃশ অন্যান্য

গ্রন্থে যে সকল বিষ্ণুস্তোত্র বা কৃষ্ণস্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা অসম্পূর্ণরূপে অদ্বৈতবাদাত্মক। কিন্তু এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্বের ভীষ্মকৃত কৃষ্ণস্তোত্র।

কিন্তু অদ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতবাদও অনেক রকম হইতে পারে। আধুনিক সময়ে শঙ্করাচার্য, রামানুজাচার্য মধ্বাচার্য এবং বল্লভাচার্য, এই চারি জনে অদ্বৈতবাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ–এই চারি প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীনকালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যা দেখা যায়। প্রথম এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগৎ, তদ্ভিন্ন জাগতিক কোন পদার্থ নাই। আর এক মত এই যে, জগৎ ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগৎ নহেন, কিন্তু ঈশ্বরে জগৎ আছে–"সূত্রে মণিগণা ইব।" ঈশ্বরও জাগতিক সর্বপদার্থে আছেন, কিন্তু ঈশ্বর তদতিরিক্ত। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশাস্ত্র সাঙ্খ্য। কপিলের সাঙ্খ্য ঈশ্বরই স্বীকার করে না। কিন্তু পরবর্তী সাঙ্খ্যেরা ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। সাঙ্খ্যের স্থূলকথা এই, জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা বা পুরুষ সম্পূর্ণরূপে সঙ্গশূন্য; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। জড়জগৎ এবং জড়জগন্ময়ী শক্তিকে ইঁহারা 'প্রকৃতি' নাম দিয়াছেন। এই প্রকৃতিই সর্বসৃষ্টিকারিণী, সর্বসঞ্চারিণী, সর্বসঞ্চালিনী, এবং সর্বসংহারিণী। এই প্রকৃতিপুরুষতত্ত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান তান্ত্রিকধর্মের উৎপত্তি। এই তান্ত্রিকধর্মে, প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বলিয়া এই ধর্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল। যাহারা বৈষ্ণবদিগের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট, তাঁহারা তান্ত্রিকধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই তান্ত্রিকধর্মের সারাংশ এই বৈষ্ণবধর্মে সংলগ্ন করিয়া এই বৈষ্ণবধর্মকে পুনরুজ্জ্বল করিবার জন্য ব্রহ্মবৈবর্তকার এই অভিনব বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছেন অথবা বৈষ্ণবধর্মের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টা রাধা সেই সাঙ্খ্যদিগের মূলপ্রকৃতিস্থানীয়া। যদিও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে আছে যে, কৃষ্ণ মূলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে

সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে দেখা যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ংই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মূলপ্রকৃতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। যথা–

"মমার্ধাংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী || "

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোকঃ।

পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি সম্বন্ধ, তাহার পুরাণকার এইরূপে বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি।

"যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদো হি নাবয়োর্ধ্রুবম্ ‖ ৫৭ ||
যথা ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্নৌ দাহিকা সতি।
যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বয়ি সন্ততম্ ‖ ৫৮ ||
বিনা মৃদা ঘটং কর্তুং বিনা স্বর্ণেন কুণ্ডলম্।
কুলালঃ স্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্তঃ কদাচন ‖ ৫৯ ||
তথা ত্বয়া বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তুমহং ক্ষমঃ।
সৃষ্টেরাধারভূতা ত্বং বীজরূপোহহমচ্যুতঃ ‖ ৬০ ||
* * * *
কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা।
শ্রীকৃষ্ণঞ্চ তদা তে হি ত্বয়ৈব সহিতং পরম্ ‖ ৬২ ||
ত্বঞ্চ শ্রীস্ত্বঞ্চ সম্পত্তিস্ত্বমাধারস্বরূপিণী।
সর্বশক্তিস্বরূপাসি সর্বেষাঞ্চ মমাপি চ ‖ ৬৩ ||
ত্বং স্ত্রী পুমানহং রাধে নেতি বেদেষু নির্ণয়ঃ।
ত্বঞ্চ সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোহহমক্ষরে ‖ ৬৪ ||
যদা তেজঃস্বরূপোহহং তেজোরূপাসি ত্বং তদা।
ন শরীরী যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরীরিণী ‖ ৬৫ ||
সর্ববীজস্বরূপোহহং যদা যোগেন সুন্দরি।
ত্বঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্বস্ত্রীরূপধারিণী ‖ ৬৬ || "

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ।

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। দুগ্ধে যেমন ধবলতা, অগ্নিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি তোমাতে সর্বদাই আছি। কুম্ভকার বিনা মৃত্তিকায় ঘট করিতে পারে না, স্বর্ণকার স্বর্ণ বিনা কুণ্ডল গড়িতে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অচ্যুতবীজরূপী। আমি যখন তোমা ব্যতীত থাকি, তখন লোকে আমাকে ‘কৃষ্ণ’ বলে, তোমার সহিত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে। তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্বশক্তিস্বরূপা। হে রাধে! তুমি স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করিতে পারে না। হে অক্ষরে! তুমি সর্বস্বরূপা, আমি সর্বরূপ। আমি যখন তেজঃস্বরূপ তুমি তখন তেজোরূপা। আমি যখন শরীরী নই, তখন তুমিও অশরীরিণী। হে সুন্দরি! আমি যখন যোগের দ্বারা সর্ববীজস্বরূপ হই, তখন তুমি শক্তিস্বরূপা সর্বস্ত্রীরূপধারিণী হও।”

পুনশ্চ,

যথাহঞ্চ তথা ত্বঞ্চ যথা ধাবল্যদুগ্ধয়োঃ।
ভেদঃ কদাপি ন ভবেন্নিশ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ‖ ৫৬ ||

* * * *

ত্বৎকলাংশাংশকলয়া বিশ্বেষু সর্বযোষিতঃ।
যা যোষিৎ সা চ ভবতী যঃ পুমান্ সোহহমেব চ ‖ ৬৮ ||
অহঞ্চ কলয়া বহ্নিস্ত্বং স্বাহা দাহিকা প্রিয়া।
ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধুঞ্চ তাং বিনা ‖ ৬৯ ||
অহং দীপ্তিমতাং সূর্যঃ কলয়া তং প্রভাত্মিকা।
সঙ্গতশ্চ ত্বয়া ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্ ‖ ৭০ ||
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ত্বঞ্চ শোভা চ রোহিণী।
মনোহরস্ত্বয়া সার্ধং ত্বাং বিনা চ ন সুন্দরি ‖ ৭১ ||
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়া স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ ত্বং সতি।
ত্বয়া সার্ধং দেবরাজো হতশ্রীশ্চ ত্বয়া বিনা ‖ ৭২ ||

www.bengaliebook.com

অহং ধর্মশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ মূর্তিশ্চ ধর্মিণী।
নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে ত্বাঞ্চ ধর্মকৃত্যে ধর্মক্রিয়াং বিনা ॥ ৭৩ ||
অহং যজ্ঞশ্চ কলয়া ত্বঞ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা।
ত্বয়া সার্ধঞ্চ ফলোদোহপ্যসমর্থস্ত্বয়া বিনা ॥ ৭৪ ||
কলয়া পিতৃলোকহহং স্বাংশেন ত্বং স্বধা সতি।
ত্বয়ালং কব্যদানে চ সদা নালং ত্বয়া বিনা ॥ ৭৫ ||
ত্বঞ্চ সম্পৎস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্বয়া সহ।
লক্ষ্মীযুক্তস্ত্বয়া লক্ষ্ম্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা || ৭৬ ||
অহং পুমাংস্ত্বং প্রকৃতির্ন স্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা।
যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্তুং মৃদা বিনা ॥ ৭৭ ||
অহং শেষশ্চ কলয়া স্বাংশেন ত্বং বসুন্ধরা।
ত্বাং শদ্যরত্নাধারাঞ্চ বিভর্মি মূর্দ্ধ্ণি সুন্দরি ॥ ৭৮ ||
ত্বঞ্চ শান্তিশ্চ কান্তিশ্চ মূর্তির্মূর্তিমতী সতি।
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা ক্ষুত্তৃষ্ণা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ||
নিদ্রা শুদ্ধা চ তন্দ্রা চ মূর্ছা চ সন্ততিঃ ক্রিয়া।
মুক্তিরূপা ভক্তিরূপা দেহিনাং দুঃখরূপিণী ॥ ৮০ ||
মমাধারা সদা ত্বঞ্চ তবাত্মাহং সমৌ প্রকৃতিপুরুষৌ।
ন হি সৃষ্টির্ভবেদ্দেবি দ্বয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮১ ||
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ৬৭ অধ্যায়ঃ।[2]

“যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি। তোমাতে আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত। এই বিশ্বের সমস্ত স্ত্রী তোমার কলাংশের অংশকলা; যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি। কলা দ্বারা আমি বহ্নি, তুমি প্রিয়া দাহিকা স্বাহা; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ করিতে সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্তিমান্দিগের মধ্যে সূর্য, তুমি কলাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দীপ্তিমান্ হই, তুমি না থাকিলে হই না। কলা দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী; তুমি সঙ্গে

থাকিলে আমি মনোহর; হে সুন্দরি! তুমি না থাকিলে নই। হে সতি! আমি কলা দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্মী; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা ধর্ম, তুমি ধর্মিণীমূর্তি; ধর্মক্রিয়ার স্বরূপা তুমি ব্যতীত আমি ধর্মকার্যে ক্ষমবান্ হই না। কলা দ্বারা আমি যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ হই, তুমি না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ। কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সতি! তুমি আপনার অংশে স্বধা ; তোমা ব্যতীত পিণ্ডদান বৃথা। তুমি সম্পৎস্বরূপা, তুমি সঙ্গে থাকিলেই আমি প্রভু; তুমি লক্ষ্মী, তোমার সহিত আমি লক্ষ্মীযুক্ত, তুমি ব্যতীত নিঃশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি প্রকৃতি ; তোমা ব্যতীত আমি স্রষ্টা নহি ; মৃত্তিকা ব্যতীত কুম্ভকার যেমন ঘট করিতে পারে না, তোমা ব্যতীত আমি তেমনই সৃষ্টি করিতে পারি না। আমি কলা দ্বারা শেষ, তুমি আপনার অংশে বসুন্ধরা ; হে সুন্দরি! শস্যরত্নাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মস্তকে বহন করি। হে সতি! তুমি শান্তি, কান্তি, মূর্তি, মূর্তিমতী, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুত্তৃষ্ণা এবং তুমি পর দয়া, শুদ্ধা, নিদ্রা, তন্দ্রা, মূর্ছা, সন্ততি, ক্রিয়া, মূর্তিরূপা, ভক্তিরূপা, এবং জীবের দুঃখরূপিণী। তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; যেখানে তুমি, সেইখানে আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইএর একের অভাবে সৃষ্টি হয় না।”

এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহাতে যাহা পাই, তাহা ঠিক সাঙ্খ্যের প্রকৃতিবাদ নহে। সাঙ্খ্যের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। প্রকৃতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাঙ্খ্যপ্রবচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুষ্পের ছায়ার উপমা বুঝাইয়াছেন। স্ফাটিক পাত্র এবং জবাপুষ্প পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্; তবে পুষ্পের ছায়া স্ফাটিকে পড়ে, এই পর্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। কিন্তু শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শক্তির আধার। যেমন আধার হইতে আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রেই আছে, এমত নহে। বৈষ্ণব পৌরাণিকেরাও সাঙ্খ্যের পরকৃতিকে বৈষ্ণবী শক্তিতে পরিণত করিয়াছেন। বুঝাইবার জন্য বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছিঃ–

“নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী।

যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তম ‖ ১৫ ||
অর্থো বিষ্ণুরিয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ো হরিঃ।
বোধো বিষ্ণুরিয়ং বুদ্ধির্ধর্মোহসৌ সৎক্রিয়া ত্বিয়ম্ ‖ ১৬ ||
স্রষ্টা বিষ্ণুরিয়ং সৃষ্টিঃ শ্রীর্ভূমির্ভূধরো অরিঃ।
সন্তোষো ভগবান্ লক্ষ্মীস্তুষ্টির্মৈত্রেয়! শাশ্বতী ‖ ১৭ ||
ইচ্ছা শ্রীর্ভগবান্ কামো যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণা তু সা।
আদ্যাহুতিরসৌ দেবী পুরোডাশো জনার্দনঃ || ১৮ ||
পত্নীশালা মুনে! লক্ষ্মীঃ প্রাগ্বংশো মধুসূদনঃ।
চিতির্লক্ষ্মীর্হবির্যুপ ইধমা শ্রীর্ভগবান্ কুশঃ ‖ ১৯ ||
সামস্বরূপো ভগবান্ উদ্গীতি কমলালয়া।
স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ‖ ২০ ||
শঙ্করো ভগবান্ শৌরির্ভূতির্গৌরী দ্বিজোত্তম।
মৈত্রেয়! কেশবঃ সূর্যস্তৎপ্রভা কমলালয়া ‖ ২১ ||
বিষ্ণুঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাশ্বততুষ্টিদা।
দ্যৌঃ শ্রীঃ সর্বাত্মকো বিষ্ণুরবকাশোহতিবিস্তরঃ ‖ ২২ ||
শশাঙ্কঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তস্যৈবানপায়িনী।
ধৃতির্লক্ষ্মীর্জগচ্চেষ্টা বায়ুঃ সর্বত্রগো হরিঃ ‖ ২৩ ||
জলধির্দ্বিজ! গোবিন্দস্তদ্বেলা শ্রীর্মহামতে!
লক্ষ্মীস্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসূদনঃ ‖ ২৪ ||
যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্ ধূমোর্ণা কমলালয়া।
ঋদ্ধিঃ শ্রীঃ শ্রীধরো দেবঃ স্বয়মেব ধনেশ্বর ‖ ২৫ ||
গৌরী লক্ষ্মীর্মহাভাগা কেশবো বরুণঃ স্বয়ম্।
শ্রীর্দেবসেনা বিপেন্দ্র! দেবসেনাপতির্হরিঃ ‖ ২৬ ||
অবষ্টম্ভো গদাপাণিঃ শক্তির্লক্ষ্মীর্দ্বিজোত্তম!।
কাষ্ঠা লক্ষ্মীর্নিমেষোহসৌ মুহূর্তোসৌ কলা তু সা।

জ্যোৎস্না লক্ষ্মীঃ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরিঃ ‖ ২৭ ||
লতাভূতা জগন্মাতা শ্রীবিষ্ণুর্দ্রুমসংস্থিতঃ ‖ ২৮ ||
বিভাবরী শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ।
বরপ্রদো বরো বিষ্ণুর্বধূঃ পদ্মবনালয় ‖ ২৯ ||
নদস্বরূপো ভগবান্ শ্রীর্নদীরুপসংস্থিতিঃ।
ধ্বজশ্চ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পতাকা কমলালয়া ‖ ৩০ ||
তৃষ্ণা লক্ষ্মীর্জগৎস্বামী লোভো নারায়ণঃ পরঃ।
রতিরাগৌ চ ধর্মজ্ঞ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ ‖ ৩১ ||
কিঞ্চাতিবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদমুচ্যতে।
দেবতির্যঙ্মনুষ্যাদৌ পুংনাম্নি ভগবান্ হরিঃ।
স্ত্রীনাম্নি লক্ষ্মীর্মৈত্রেয়! নানয়োর্বিদ্যতে পরম্ ‖ ৩২ || ”
শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেহংশে অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

“বিষ্ণুর শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে দ্বিজোত্তম! বিষ্ণু সর্বগত, ইনিও সেইরূপ। ইনি বাক্য, বিষ্ণু অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, বিষ্ণু বোধ; ইনি ধর্ম, ইনি সৎক্রিয়া; বিষ্ণু স্রষ্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি ভূধর; ভগবান্ সন্তোষ, হে মৈত্রেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্ কাম; তিনি যজ্ঞ, ইনি দক্ষিণা; জনার্দন পুরোডাশ, দেবী আদ্যাহুতি; হে মুনে; লক্ষ্মী পত্নীশালা, মধুসূদন প্রাগ্বংশ; হরি যূপ, লক্ষ্মী চিতি; ভগবান্ কুশ, শ্রী ইধমা; ভগবান্ সাম, কমলালয়া উদ্গাতি; লক্ষ্মী স্বাহা, জগন্নাথ বাসুদেব অগ্নি; ভগবান্ শৌরি শঙ্কর, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী গৌরী; হে মৈত্রেয়! কেশব সূর্য, কমলালয়া তাঁহার প্রভা; বিষ্ণু পিতৃগণ, পদ্মা নিত্যতুষ্টিদা স্বধা; শ্রী স্বর্গ, সর্বাত্মক বিষ্ণু অতিবিস্তৃত আকাশস্বরূপ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাঁহার অক্ষয় কান্তি; লক্ষ্মী জগচ্চেষ্টা ধৃতি, বিষ্ণুসর্বত্রগ বায়ু; হে দ্বিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে! শ্রী তাঁহার বেলা; লক্ষ্মী ইন্দ্রাণী স্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়া ধূমোর্ণা; শ্রী ঋদ্ধি, শ্রীধর স্বয়ং দেবধনেশ্বর; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষ্মী হে গৌরী; হে বিপেন্দ্র! শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপতি; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোত্তম! লক্ষ্মী শক্তি; লক্ষ্মী কাষ্ঠা, ইনি

নিমেষ; ইনি মুহূর্ত, তিনি কলা; লক্ষ্মী আলোক, সর্বেশ্বর হরি সর্বপ্রদীপ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ্ণু দ্রুমরূপে সংস্থিত; শ্রী বিভাবরী, দেবচক্রগদাধর দিবস; বিষ্ণু বরপ্রদ বর, পদ্মবনালয়া বধূ; ভগবান্ নদস্বরূপী, শ্রী নদীরূপা; পুণ্ডরীকাক্ষ ধ্বজ, কমলালয়া পতাকা; লক্ষ্মী তৃষ্ণা, জগৎস্বামী নারায়ণ পরম লোভ; হে ধর্মজ্ঞ! লক্ষ্মী রতি, গোবিন্দ রাগ; অধিক উক্তির প্রয়োজন নাই, সংক্ষেপে বলিতেছি, দেব তির্যক্ মনুষ্যাদিতে পুংনামবিশিষ্ট হরি, এবং স্ত্রীনামবিশিষ্টা লক্ষ্মী। হে মৈত্রেয়! এই দুই ভিন্ন আর কিছুই নাই।”

বেদান্তের যাহা মায়াবাদ সাঙ্খ্যে তাহা প্রকৃতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ। এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মিলিত হইল। বোধ হয়, ইহাই স্মরণ রাখিয়া ব্রহ্মবৈবর্তকার লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন যে, তুমি না থাকিলে, আমি কৃষ্ণ, এবং তুমি থাকিলে আমি শ্রীকৃষ্ণ। বিষ্ণুপুরাণকথিত এই শ্রী লইয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণ। পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণুপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা সম্বন্ধে ঠিক তাহাই কথিত হইয়াছে। রাধা সেই শ্রী। পরিচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াছি, “শ্রীরাধা”। রাধা ঈশ্বরের শক্তি, উভয়ের বিধিসম্পাদিত পরিণয়, শক্তিমানের শক্তির স্ফূর্তি, এবং শক্তিরই বিকাশ উভয়ের বিহার।

যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তৎকথিত ‘রাধাতত্ত্ব’ কি, তাহা বোধ করি এতক্ষণে পাঠককে বুঝাইতে পারিলাম। কিন্তু আদিম ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে ‘রাধাতত্ত্ব’ ছিল কি? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে রাধা শব্দের ব্যুৎপত্তি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে। তাহার দুইটি পূর্বে ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়াছি, আর একটি উদ্ধৃত করিতেছি:–

“রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ ‖ ১০৬ ||
ধকার আয়ুষো হানিমাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ ‖ ১০৭ ||
রাকারো নিশ্চলাং ভক্তিং দাস্যং কৃষ্ণপদাম্বুজে।
সর্বেস্পিতং সদানন্দং সর্বসিদ্ধৌঘমীশ্বরম্ ‖ ১০৮ ||

ধকারঃ সহবাসঞ্চ তত্তুল্যকালমেব চ।
দদাতি সার্ষ্টিং সারূপ্যং তত্ত্বজ্ঞানং হরেঃ সমম্ ‖ ১০৯ || ”
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণম্, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৩ অঃ।

ইহার একটিও রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি নয়। রাধ্ ধাতু আরাধনার্থে, পূজার্থে। যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা। বর্তমান ব্রহ্মবৈবর্তে এ ব্যুৎপত্তি কোথাও নাই। যিনি এই রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলা অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বারা ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং ভ্রান্তির প্রতিপোষণার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন,[3] তিনি কখনও ‘রাধা’ শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন। যিনি রাধা শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তির অনুযায়িক হইয়া রাধারূপক রচনা করেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্তা নহেন। সেই জন্য বিবেচনা করি যে, আদিম ব্রহ্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি। এবং সেখানে রাধা কৃষ্ণারাধিকা আদর্শরূপিণী গোপী ছিলেন, সন্দেহ নাই।

রাধা শব্দের আর একটি অর্থ আছে–বিশাখানক্ষত্রের[4] একটি নাম রাধা। কৃত্তিকা হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র। পূর্বে কৃত্তিকা হইতে বৎসর গণনা হইত। কৃত্তিকা হইতে রাশি গণনা করিলে বিশাখা ঠিক মাঝে পড়ে। অতএব রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তিনী হউন বা না হউন, রাধা রাশিমণ্ডলের বা রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তী বটেন। এই ‘রাসমণ্ডলমধ্যবর্তিনী’ রাধার সঙ্গে ‘রাসমণ্ডলে রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা আসল ব্রহ্মবৈবর্তের অভাবে স্থির করা অসাধ্য।

----

[1] রাসে সম্ভূয় গোলোকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভির্দ্বিজোত্তম ‖-ব্রহ্মখণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ।
কিন্তু আবার স্থানান্তরে,-
* * * রাকারো দানবাচকঃ।
ধা নির্বাণঞ্চ তদ্দাত্রী তেন রাধা প্রকির্তিতা ‖-শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ।

2 বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা উদ্ধৃত করা গেল। মূলে কিছু গোলযোগ আছে বোধ হয়।

3 রাধাশব্দস্য ব্যুৎপত্তিঃ সামবেদ নিরূপিতা ‖ ১৩ অঃ, ১৫৩।

4 রাধা বিশাখা পুষ্যে তু সিধ্যতিযৌ শ্রবিষ্ঠয়া-অমরকোষ।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি

ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধীয় আর কয়েকটা কথা আছে।

১ম, নন্দ এক দিন স্নান করিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বরুণালয়ে যায়। কৃষ্ণ সেখানে গিয়া নন্দকে লইয়া আসেন। শাদা কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাঁহাকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।

২য়, একটা সাপ আসিয়া এক দিন নন্দকে ধরিয়াছিল। কৃষ্ণ সে সর্পের মুখ হইতে নন্দকে মুক্ত করিয়া সর্পকে নিহত করিয়াছিলেন। সর্পটি বিদ্যাধর। কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে। শাদা কথায় কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

৩য়, শঙ্খচূড় নামে একটা অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনয়দিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত করেন এবং শঙ্খচূড়কে বধ করেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শঙ্খচূড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বে বলিয়াছি।

৪র্থ, এই তিনটা কথা বিষ্ণুপুরাণে, হরিবংশে বা মহাভারতে নাই। কিন্তু কৃষ্ণকৃত অরিষ্টাসুর ও কেশী অসুরের বধবৃত্তান্ত হরিবংশে ও বিষ্ণুপুরাণে আছে এবং মহাভারতে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে। অরিষ্ট বৃষরূপী এবং কেশী অশ্বরূপী। শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন।

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বলিয়া উড়াইয়া দিলে অরিষ্টবধ ও কেশিবধকে সেরূপে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তান্ত অথর্বসংহিতায় আছে বলিয়াছি। সেখানে কেশীকে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে। কৃষ্ণকেশী অর্থে যার কাল চুল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও একটি কেশিসূক্ত আছে (দশম মণ্ডল, ১৩৬ সূক্ত)। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত। ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক্ হইতে এমন বুঝা যায় যে, হয়ত মুনিই কেশী–দেবতা। মুনিগণ লম্বা লম্বা চুল রাখিতেন। ঐ দুই ঋকে

মুনিগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে। Muir সাহেবেও সেইরূপ বুঝিয়াছেন। কিন্তু প্রথম ঋকে, অন্যপ্রকার বুঝান হইয়াছে। প্রথম ঋক্ রমেশ বাবু এইরূপ বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন:–

"কেশী নামক যে দেব, তিনি অগ্নিকে, তিনিই জলকে, তিনি ভূলোক ও দ্যুলোককে ধারণ করেন। সমস্ত সংসারকে কেশীই আলোকের দ্বারা দর্শনযোগ্য করেন। এই যে জ্যোতি, ইহার নাম কেশী।"

তাহা হইলে, জগদ্ব্যঞ্জক যে জ্যোতি, তাহাই কেশী। এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, তাহাই কৃষ্ণকেশী। কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্তা, অর্থাৎ কৃষ্ণ জগদাবরক তমঃ প্রতিহত করিয়াছিলেন।

এইখানে বৃন্দাবনলীলার পরিসমাপ্তি। এক্ষণে আলোচ্য যে, আমরা ইহার ভিতর পাইলাম কি? ঐতিহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বলিলেই হয়। এই সকল পৌরাণিক কথা অতিপ্রাকৃত উপন্যাসে পরিপূর্ণ। তাহার ভিতর ঐতিহাসিক তত্ত্ব অতি দুর্লভ। আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে–চৌরবাদ এবং পরদারবাদ–সে সকলই অমূলক ও অলীক। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা এত সবিস্তারে ব্রজলীলার সমালোচনা করিয়াছি। ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,–অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবে রূপলাবণ্যে এবং শিশুসুলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের অনিষ্টকারী পশু প্রভৃতি হনন করিয়া গোপালগণকে সর্বদা রক্ষা করিতেন। তিনি শৈশবাবধিই সর্বজন এবং সর্ব্বজীবে কারুণ্যপরিপূর্ণ–সকলের উপকার করিতেন। গোপালগণ প্রতি এবং গোপবালিকাগণ প্রতি তিনি স্নেহশালী ছিলেন। সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করিতেন এবং সকলকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্ত্বও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এতটুকু ঐতিহাসিক তত্ত্বও যে পাইয়াছি, ইহাই সাহস করিয়া বলিতে পারি না। তবে ইহাও বলিতে পারি যে, ইহার বেশি আর কিছু নয়।